4189

E/44

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
★ BANIPUR. ★

শিক্ষা ও শিক্ষানীতি

4189

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম. এ., বি. টি.

কাব্যতীর্থ, সাহিত্যভারতী (বিশ্বভারতী), সাহিত্যসরস্বতী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন"

রিসার্চ্চ স্কলার ও "বাংলার শিক্ষক"

পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

S.C.E.R.T. West Bengal Library Calcutta 25/3, B. C. Road

ওরিয়েণ্ট লংম্যানস্ লিমিটেড

কলিকাতা :: বোম্বাই :: মাদ্রাজ

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স লিমিটেড
১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩
নিকল রোড, ব্যালার্ড এষ্টেট্, বোম্বাই-১
৩৬এ মাউণ্ট রোড মাদ্রাজ-১

লংম্যান্স গ্রীন এণ্ড কোং লিমিটেড
৬-৭ ক্লিফ্‌ফোর্ড ষ্ট্রীট্, লণ্ডন, ডব্লুউ-১
৫৩১ লিট্‌ল্‌কোলীন্স্ ষ্ট্রীট্ মেলবোর্ণ সি-১
বোস্‌টন হাউস, ষ্ট্র্যাণ্ড ষ্ট্রিট্, কেপটাউন

লংম্যান্স গ্রীন কোম্পানী (ইন্‌ক্ঃ)
৫৫ ফিপ্‌থ এভিনিউ, নিউইয়র্ক-৩

লংম্যান্স গ্রীন এণ্ড কোম্পানী
২১৫ ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট্, টরণ্টো-১

S.R.T. W.B. LIBRARY
19.11.2001
10284

প্রথম সংস্করণ—১৯৫০

মূল্য—৩৷৷০

মুদ্রাকর—শ্রীতীর্থনাথ পাল, নবজীবন প্রেস, ৬৬, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

নিবেদন

সারা বিশ্বের বুকে আজ এক পটপরিবর্ত্তনের পালা সুরু হইয়াছে। দিকে দিকে রক্তপিচ্ছিল পথে ও প্রান্তরে নূতন সৃষ্টির বীজ বপনের এই পরম সন্ধিক্ষণে ভারতের দিগঞ্চলে দেখা দিয়াছে স্বাধীনতার নূতন সূর্য্য। কিন্তু আজও চারিদিকে যেন নিবিড় কুহেলিকা। যুগসঞ্চিত তমোজাল খণ্ড-ছিন্ন করিয়া জ্ঞানের শিখা আজও পল্লীপ্রান্তের পর্ণকুটীরে গিয়া পৌঁছায় নাই।

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্র আজ নব নব সমস্যায় সমাকীর্ণ। বৃহত্তর সমাজের সংকট শিক্ষাজগতেও নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাই যে জাতীয়জাগরণের জোয়ারের প্রতীক্ষায় কত শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনাকে কি ভাবে ব্যাপক ও সর্ব্বগ্রাহী করা যায় তাহাই আজ বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

দেশের কতশত প্রতিভা আত্মপ্রকাশের অভাবে অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদেরই অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা, উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যই ইহার জন্য দায়ী। কিশোরের মনোরাজ্যের সহিত পরিচয়ের অভাবে আজ শিক্ষা-ক্ষেত্রে ও বৃহত্তর জীবনেও এই সমস্যা নানারূপে অবাঞ্ছিত পরিণতি অর্পণ করিতেছে।

তাই এ বিষয়ে জনজাগরণের আশায় আমার এই গ্রন্থখানি সকলের হাতে তুলিয়া দিলাম। জাতির উন্নতির পথে শিক্ষার অমোঘ প্রভাবের কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই যুগসংকটের মুহূর্ত্তে শিক্ষার বর্ত্তমান রূপ, শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও সমস্যা এবং প্রত্যেক শিক্ষক, অভিভাবক ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইবার বিশেষ অবসর ঘটিয়াছে। তাই যাহাতে প্রত্যেকেই আপনাদের সন্তানসন্ততি, আত্মীয় শিশুকিশোরগণকে যোগ্যতম নাগরিকের আসনে অধিষ্ঠিত করিতে পারেন, যাহাতে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার সংস্কারে সমবেত চেষ্টা ফলপ্রসূ হইতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। আশা করি **শিক্ষকশিক্ষণ বিভাগের** প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যেক বিদ্যানিকেতনের পরিচালকবর্গ এবং সাধারণ পাঠক ও অভিভাবকগণকে গ্রন্থখানি রস ও তথ্যের সন্ধান দিতে পারিবে। যাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি রচিত, পুস্তকখানি তাঁহাদের উপকারে আসিলে আমার প্রয়াসকে সার্থক বলিয়া মনে করিব।

মহালয়া
৯৫, রসা রোড,
কলিকাতা।

গ্রন্থকার

4189

কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞপ্তি

সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার করিতে কুণ্ঠা নাই যে সারগর্ভ নির্দ্দেশে ও বিষয়বস্তুর পরিমার্জ্জন ব্যাপারে আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের সহ-অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে অসামান্য সাহায্য করিয়াছেন তাহা পুস্তক-খানির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে ও আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছে।

শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণ, শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষবৃন্দ ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী আমাকে অনুরূপ গ্রন্থের উপযোগিতা সম্পর্কে অন্তহীন অনুপ্রেরণা দিয়া আমার শ্রদ্ধাভাজন হইয়া আছেন। তাঁহাদের চরিত্রের পুত আদর্শ ও পবিত্র জীবনের কথা স্মরণ করিয়া আমি সকলের নিকট হইতে সহানুভূতিপূর্ণ নির্দ্দেশ ও শুভকামনার প্রতীক্ষায় রহিলাম। পরিশেষে সুযোগ্য বন্ধু শিক্ষা-বিভাগের কৃতী ছাত্র শ্রীদিবাকর দাস মহান্ত বি. টি. মহাশয়কে পুস্তকখানির প্রুফ সংশোধন করিয়া দিবার জন্য আমার আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR.

উৎসর্গ

যাঁহার পূত জীবনাদর্শ আমার মনে শাশ্বত অঙ্ক
রাখিয়া গিয়াছে—সেই স্বর্গীয় পরমারাধ্য

পিতৃদেবের

শ্রীচরণে।

প্রয়োজনীয় পুস্তকের নির্ঘণ্ট

শিক্ষা—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আমাদের শিক্ষা—	ডাঃ ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ
The Future of Civilization—	*Radhakrishnan*
On Education—	*Bertrand Russell*
Principles of Education—	*Thomas & Lang*
Democracy & Education—	*John Dewey*
Wardha Scheme—	*Varkey*
Principles of Education—	*Thorndike & Gates*
Groundwork of Educational Theory—	*Ross*
Education : Its Data & First Principles—	*Nunn*
Philosophic Bases of Education—	*Rusk*
Conflicting Theories of Education—	*Kandel*

বিষয় সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবতরণিকা

(ক) শিক্ষা ও শিক্ষার ধারা

শিক্ষা ও শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বহুদিন হইতে মতবিরোধ দেখা গিয়াছে। বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন মতবাদ, সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকেও পা ফেলিয়া চলিতে হইয়াছে। তাই শিক্ষার অন্যতম সার্থকতা এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে—অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণই শিক্ষা। এই ক্রমনিয়ন্ত্রণের ফলেই সেই বর্ব্বর যুগের মানুষের ও আধুনিক যুগের মানবের মধ্যে এক বিপুল ব্যবধান। ইহাদের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য ব্যতীত রুচি, চিন্তাধারা, প্রকৃতি ও জীবনযাত্রায় আজ কোন মিলই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শিক্ষার ফলেই এই আমূল পরিবর্ত্তন, এই রুচিগত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এমন কি অভ্যাসের পরিবর্ত্তনও শিক্ষাদ্বারা সাধিত হয়।

কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি জাতীয় জীবনে এই আত্মনিয়ন্ত্রণ চলিতে থাকে। সমাজজীবনেও এই নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে ঘটিতে দেখা যায়। মোটকথা জীবন ভরিয়া যে পরিবর্ত্তন যে নিয়ন্ত্রণ ঘটিতে থাকে তাহার মূলে আছে শিক্ষা।

এখন দেখা যাউক কি ভাবে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যুগে যুগে নিয়ন্ত্রিত হইয়া মানবের সাময়িক প্রয়োজনকে মিটাইবার প্রয়াস পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা প্রভাবিত। তাই তিনি শিক্ষা ও শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে যে সংকেত দিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান হানাহানি ও সংঘাতময় যুগে বিশেষ সারগর্ভ ও ফলপ্রসূ। তিনি বলিয়াছেন—"মানুষের জ্ঞান বর্ব্বরতা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে—মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্ব্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। আজ তার জ্ঞান অণু হ'তে অণুতম ও বৃহৎ হ'তে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হ'য়েছে, এই হ'চ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা। ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হ'চ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ! সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা। তবে কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতাশিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।......ঐশ্বর্য্যকে সঞ্চিত ক'রে তোলা নয়, আত্মাকে

সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।”

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রকৃত আলোকপাত করিতে হইলে শিক্ষার ধারা ও শিক্ষাজগতের ভাঙ্গাগড়া সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন।

বিভিন্ন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে যে প্রতিফলন ঘটিয়াছে যে বিভিন্ন স্তর বা পর্য্যায় ভেদ করিয়া শিক্ষার ধারা অগ্রগতি লাভ করিতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আলোচ্য।

(১) **প্রথম স্তর**—(আনুমানিক ৫০০ খৃঃ পূঃ) এই সময়ে চরিত্রগঠনই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহজগৎ অপেক্ষা পরলোকের জন্য প্রস্তুতিকরণই যেন শিক্ষা-জগতেও বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

(২) তারপর এই ধারা পরিবর্ত্তিত রূপে জ্ঞানাহরণের দিকে উদ্দিষ্ট হইল। মানবকল্যাণ ও মানবিক সত্তাকে কেন্দ্র করিয়া বিবিধ জ্ঞানের বৈচিত্র্যময় পরিবেশনের দিকে শিক্ষার লক্ষ্য পড়িল, কিন্তু ক্রমশঃ এই লক্ষ্যেরও পরিবর্ত্তন ঘটিল।

(৩) বিজ্ঞানের ও জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের দিকে এইবার শিক্ষার লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইল। কেবল ধ্যানধারণাতেই নহে, সক্রিয়তা ও বিজ্ঞানের দিকেও শিক্ষাকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইল।

(৪) ক্রমশঃ শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাপরিকল্পনার সহিত প্রকৃতিজগতের যোগাযোগ স্থাপিত হইল। শিক্ষাক্ষেত্রে

প্রকৃতির অসামান্য প্রভাব স্বীকৃত হইল এবং পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্ত্তে—প্রকৃতির কোলে স্বতস্ফূর্ত্তভাবে শিক্ষাদানের আয়োজন সুরু হইল। অ্যারিষ্টটল (Aristotle) ও লক (Lock) প্রমুখ মনীষীরা চিত্তের উৎকর্ষসাধন ও মানসিক শক্তির বিকাশকেই শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—মানসিক বৃত্তি সংহতিকরণেব উদ্দেশ্যে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আনন্দের সন্ধান দিয়া 'সুস্থ দেহে সুস্থ মনের' প্রতিষ্ঠা, কথোপকথনে বিভিন্ন দেশের ভাষা শিক্ষায় মনকে কর্ম্মঠ করিয়া তোলা ও জীবনকে বাস্তবের অভিমুখী করার মধ্যে ইঁহারা শিক্ষার সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। মোট কথা, দেহগঠন, কর্ম্মশক্তি সঞ্চার, সমাজচেতনা ও নাগরিকতাবোধ প্রভৃতি জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন প্রস্তুতিকরণই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইল। এই প্রসঙ্গে বলা যায়; রুশো এই মতবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার পর বহু মনীষীর অবদান তাঁহার মতবাদকে সুষ্ঠু ও সর্ব্বগ্রাহী করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে Naturalistic View of Education বলা চলে।

(৫) এইবার বিষয়বস্তু হইতে শিশুর দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ ঘটিল। তারপর আসিলেন পেষ্টালৎসি (Pestalozzi), হার্বার্ট (Herbert) প্রভৃতি মনীষী। ইঁহাদের মতে শিক্ষা জীবনের একটি বৃহত্তর আদর্শের সোপান মাত্র। এই প্রসঙ্গে

কমিনিয়াসের (Comenius) নাম উল্লেখযোগ্য। রুশোর (Rousseau) শিক্ষাপরিকল্পনার মধ্যে যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল পেষ্টালৎসি (Pestalozzi), হার্বার্ট (Herbert) প্রমুখ মনীষীদের প্রচেষ্টায় তাহা স্পষ্টতর ভাবে রূপায়িত হইল। শিশুর চিত্তবৃত্তি, কৌতূহলকে কেন্দ্র করিয়া সকল পাঠক্রম পরিকল্পিত করা ইঁহাদের মতে একান্ত অপরিহার্য্য। অবশ্য রুশো প্রথম বার বৎসর মানুষের দেওয়া শিক্ষা হইতে শিশুকে দূরে সরাইয়া রাখিবার নির্দ্দেশ দিলেও তাঁহার পরবর্ত্তী শিক্ষাধিনায়কগণ এ বিষয়ে রুশোর অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে পরিমার্জ্জিত করিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, রুশোর প্রতিভা অলৌকিক —তাই তাঁহার মতবাদের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি আপাতদৃষ্ট হইলেও তিনি ভাবী শিক্ষার পরিকল্পনার যে ইঙ্গিত সেযুগেই ব্যক্ত করিয়াছেন—যে বীজ তাঁহার পরিকল্পনার মধ্যে বপন করিয়া গিয়াছেন তাহা আজ মহীরুহে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শিক্ষার একটি আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গী যেন এই যুগে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে যেন মেশামেশি হইয়া গিয়াছিল। যাঁহারা এই দার্শনিকতাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বার্কলে (Berkley), ডেকার্টে (Descartes), ফিক্টে (Fichte), হিগেল (Hegel), হিউম (Hume), কাণ্ট (Kant), প্লেটো (Plato), স্পিনোজা (Spinoza), সক্রেটিস

(Socrates) প্রভৃতি মনীষীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেহ বা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের জন্য, কেহ বা সেই অলক্ষ্য শক্তিকে আপনার মধ্যে প্রতিফলিত দেখিবার জন্য, আবার কেহ বা কর্ম্মের দ্বারা সেই শক্তিকে উপলব্ধি করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

মানবপ্রকৃতির মধ্যেই, শিশুর অন্তরেই যে বিশ্বের সামগ্রিক ভাবমূর্ত্তি বিরাজমান এবং শিল্পীর ন্যায় সেই ভাবমূর্ত্তিকে একে একে উদ্‌ঘাটিত করাই যে শিক্ষা ও শিক্ষকের দায়িত্ব ইহাই শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শবাদের (Idealism) মূল সুর। ইহাদের মতে বাস্তবের মধ্যে সত্যসুন্দরের প্রকাশকে অনুভব করার মধ্যেই শিক্ষার চরম সার্থকতা। এইরূপে শিক্ষাজগতে ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে নূতন নূতন মতবাদের সৃষ্টি হইল।

(৬) এইবার জীবন একটি যন্ত্ররূপে কল্পিত হইল, অর্থাৎ সমগ্র জীবন যেন যান্ত্রিক রীতিতে উন্মোচিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়— ইহার মধ্যে অনুভূতির কোন স্থান নাই। ফরাসী দার্শনিকেরা এই মতবাদের পরিপোষক। কিন্তু যদি শিক্ষার্থীর জীবনকে যন্ত্ররূপে দেখা যায় তবে সেই যন্ত্র পরিচালনার কার্য্য শিক্ষককে গ্রহণ করিতে হয়, আবার শিক্ষকের প্রাধান্য আসিয়া পড়ে। আদর্শবাদের চরম ও চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ারূপে এই মতবাদ দেখা দিয়াছিল। লা মেট্রি (La Meterie) প্রভৃতি মনীষীর নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ইহাদের মতবাদ সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"The human body is a machine that winds up its own springs, a living image of perpetual motion." অথবা "Man the machine....is moved, directed, commanded, by exterior influences solely. He originates nothing—not even a thought."

(৭) বর্ত্তমানে শিক্ষার ধারা যে পথে চলিয়াছে তাহাকে একদিকে আদর্শবাদ (Idealism) অন্যদিকে প্রাকৃতবাদের (Naturalism-এর) সমষ্টিগত পরিণতি বলিলে ভুল হয় না। উভয়ের সীমারেখায় এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা। এই মতবাদকে ইংরাজীতে Pragmatism বলা চলে। ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রাধান্য আরোপ করায় আদর্শবাদের সহিত ইহার সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। অপর দিকে সমগ্র সত্যকে পরিণামের দ্বারা বিচার করিবার প্রবৃত্তি, এই মতবাদের একটি বৈশিষ্ট্য।

জীবনের সহিত শিক্ষার যে সম্পর্ক ডিউয়ি (Dewey) প্রভৃতি মনীষী দেখিতে পাইয়াছেন তাহা অবিচ্ছেদ্য। জেমস্ (James), শিলার (Scheller) প্রভৃতিও এই মতবাদের পরিপোষক। ইহাদের মতে শিক্ষার কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই—ক্রমপরিণতির মধ্যেই ইহার সার্থকতা। বর্ত্তমান যুগে ডিউয়ির এই মতবাদ বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার পরিকল্পনা শিক্ষাজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

(খ) জীবন—শিক্ষা—সাহিত্য

জীবনের সহিত শিক্ষার যে সম্পর্ক শিক্ষার সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ তাহা হইতে কম নিবিড় নহে।

রসবোধ জীবনের একটি বিশেষ ধর্ম্ম, তাই জীবনকে বিচিত্র অনুভূতির পটভূমিকা বলা চলে। আবার এই অনুভূতিকে উপভোগ্য করিতে হইলে চাই শিক্ষা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"প্রত্যহের দিন যাপনের গ্লানি ও ম্লানিমার সংশয় ও সংগ্রামের উর্দ্ধে ও অতীত ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিবার বাহন এই শিক্ষা।"

শিক্ষার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। অনেকে শিক্ষাকে পরিবেশ অনুযায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার নামান্তর বলিয়া অভিমত পোষণ করেন। আবার অনেকের মতে শিক্ষা জীবনের অভাব মোচনের উপায়বিশেষ। কিন্তু এই দুইটি মতবাদ উদার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে।

আর একজন মনীষী জীবনকে শিক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই—তাঁহার মতে জীবনই শিক্ষা ও শিক্ষাই জীবন।

জীবনায়নের বিপুল পরিধির মধ্যে সত্যই শিক্ষার স্থান কোথায়? ইহাই প্রশ্ন। ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর: শিক্ষা সভ্যতার সোপান—মানুষের চলার পথের শ্রেষ্ঠ সম্বল ও সভ্যজগতের পরম অবদান। বর্ত্তমান যুগের জীবন-যাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত্তে আলাপ-

আলোচনায় ধ্যানধারণায় শিক্ষার অশেষ প্রভাব। জীবনের সহিত শিক্ষাকে বর্ত্তমান সভ্যতা এইরূপভাবে গ্রথিত করিয়াছে —যাহাতে দুইএর মধ্যে ব্যবধানটুকু অতি তুচ্ছ। কালের আবর্ত্তনে যে বিচিত্র ঘটনাসংঘাত আমাদের অভিজ্ঞতার ডালি তিলে তিলে পূর্ণ করিতেছে—তাহাই ত পরম বস্তু ও চরম শিক্ষা।

প্রতিদিনের আনন্দ-বেদনা জানাশোনার রাজ্য হইতে যে বিচিত্র অনুভূতি আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হানে—তাহাই ত' শিক্ষার সামগ্রী।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শিক্ষা বলিয়া একটি বিশেষ বস্তু নাই—ইহা জীবনের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট—ইহার অন্ত নাই, ক্রমপরিণতির মধ্যেই ইহার সার্থকতা।

এখন দেখা যাউক, জীবন ও সাহিত্যের সহিত শিক্ষার সম্পর্ক কোথায়। জীবন সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই—আপন সত্তার অনুভবই জীবন। এই সমষ্টি-জীবনের প্রতিচ্ছবিই সাহিত্যে রূপ পায়। যেখানেই সুরু হয় জীবনের প্রকৃত সাধনা, সেখানেই সাহিত্যের অভিযান। বাস্তব জীবন হইতে শিক্ষার মধ্য দিয়া আমরা যে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি আহরণ করি তাহারই প্রকাশ হয় সাহিত্যের সোনালী পর্দ্দায়। জীবনের কান্নাহাসি ও বিরহ-মিলনের স্তরকে অতিক্রম করিলে পাওয়া যায় সাহিত্যের রাজ্য—এক আনন্দময় লোক—যেখানে ধ্বনিত হইতেছে সত্য-সুন্দরের জয়গান। এবং শিক্ষাই এই

মোহঘেরা পথ অতিক্রম করিতে সহায়তা করিয়া আমাদিগকে সেই আনন্দলোকের সন্ধান দেয়।

আজ যান্ত্রিকতা ও বাস্তববাদের রাজ্যে সাহিত্য ও শিক্ষা লইয়া মতবার্দের তুফান উঠিয়াছে। কিন্তু একটি কথা আমরা বারংবার ভুলিয়া যাইতেছি যে যুগের দোহাই দিয়া ইহাদের বিকৃত সাধনা করিলেই যুগের সম্মান দেওয়া হইবে না। সরস্বতীপ্রতিমাকে মরালবাহিনী না করিয়া বিমানপোতের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেই স্নেহবিহ্বল আনন্দমূরতির শ্রীবৃদ্ধি হইবে না—বরঞ্চ প্রাণহানি ঘটিবারই সম্ভাবনা, তবে প্রতিমার বর্ণবৈচিত্র্য ও রূপবিন্যাস ব্যাপারে শিল্পীর অনেকখানি স্বাধীনতা থাকে—এইখানেই তার কল্পনা পথ খুঁজিয়া পায়। শিক্ষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও এ কথা বলিলে ভুল হইবে না। রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য ও শিক্ষা সমগ্র মনুষ্যত্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে—এবং এইখানেই সাহিত্য ও শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ঘটিল। মনুষ্যত্ব বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার পরিবর্তন নাই; তাহার যে পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে সে কেবল বাহিরের—কারণ মনুষ্যত্ব বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার মূলগত পরিবর্তন নাই—সে যে সচ্চিদানন্দের রূপায়িত প্রকৃতি! সেইরূপ শিক্ষা ও সাহিত্যের মূলে একটি অন্তর-দর্শন আছে যাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহাদের সত্তারই বিনাশ ঘটিবে।

আজ ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় স্থরু হইয়াছে, নূতন নূতন শিক্ষা পরিকল্পনা আজ বাস্তবে পরিণত হইতে

চলিয়াছে, সেইজন্য এই প্রসঙ্গে দুই একটি কথা বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

আবার সংস্কৃত যে আজ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকট বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে আছে শিক্ষার সহিত সাহিত্যের উপযুক্ত সমন্বয়ের অভাব।

অস্বীকার করিলে ভুল হইবে যে আমাদের অধিকাংশ পাঠ্যতালিকার সহিত জীবনের সংযোগ অল্প—ফলে জীবনরস হইতে বঞ্চিত হইয়া বিষয়গুলি একান্ত শুষ্ক ও এমন কি নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। ইহার কারণ নিরূপণ করিতে গেলে দেখা যায় —এই প্রাণহীনতার মূলে রহিয়াছে রসের দৈন্য, ছাত্রগণের প্রতি মমত্ববোধের অভাব ও শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাইতে পারে 'ব্যাকরণ'কে ; অবশ্য অনেকের মতে ব্যাকরণ শিশুর স্কন্ধে অকারণ বোঝা হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে এই ব্যাকরণকে ছাত্রগণের নিকট বিশেষ করিয়া শিশুমহলের সম্মুখে এইরূপভাবে ছবি, গল্প ও ছড়ার মধ্য দিয়া উপস্থাপিত করা যায় যাহাতে তাহারা বিষয়টির মধ্যে রসের সন্ধান পাইতে পারে। এবিষয়ে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে তাহারা যে বিদ্যা অর্জন করে তাহা একান্ত পুঁথিগত। ফলে স্বাস্থ্য পড়িয়াও তাহাদের দেহ রোগের আকর হইয়া থাকে, বিজ্ঞান পড়িয়াও সামান্য কোন বস্তু সারাইবার জন্য মিস্ত্রীর কাছে ছুটিতে হয়।

এখানে দেখা যায় যে শিক্ষার সহিত জীবনের যোগসূত্র শিথিল।

অতএব দেখা যায় যে যদি জীবন, শিক্ষা ও সাহিত্যের মধ্যে প্রকৃত সামঞ্জস্য বিধান করা যায় ও ত্রয়ীর সমন্বয় সাধনে তৎপরতা অবলম্বন করা যায় তবে শিক্ষার প্রকৃত রূপ ছাত্রগণের চিত্তপটে প্রতিফলিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

জীবন, শিক্ষা ও সাহিত্যকে কেবল পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্থান দিলেই চলিবে না—বিদ্যায়তনের ও কর্মজীবনের ক্ষেত্রে তাহার যথাসম্ভব প্রয়োগের প্রয়োজন। *

(গ) শিক্ষা—ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

শিক্ষার স্বরূপ কি, ইহার সহিত ধর্ম্মের ও বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক ? সে বিষয়েও আলোচনার প্রয়োজন।

যুগে যুগে মানবের মনোরাজ্যে নিত্য নূতন ভাঙাগড়া চলিতে থাকে। তাই দেখিতে পাই, যখন হইতে মানুষ শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিল, তখন হইতেই এই শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া কতই না জল্পনা-কল্পনা, কতই না অন্বেষণ। কিন্তু এই অনন্ত জিজ্ঞাসার আজও উত্তর মিলিয়াছে কিনা কে জানে ?

উপনিষদের যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল আত্মোপলব্ধি। 'আত্মানং বিদ্ধি' এই বাণীই ছিল শিক্ষার্থীর প্রতি চরম নির্দেশ।

* প্রবন্ধটি 'Teacher's Journal'এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বহুকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদৃপ্ত কণ্ঠের মধ্যে আমরা তাহার প্রতিধ্বনি খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম, তারপর যখন বর্ত্তমান যুগে আমরা পদার্পণ করি তখন দেখি শিক্ষার সহিত জীবনের মেশামেশি হইয়া গিয়াছে—তাহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ সীমারেখা নাই। আজ যাঁহারা চিন্তানায়ক তাঁহাদের মতে জীবনই শিক্ষা আবার শিক্ষাই জীবন, অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তে পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্যবিধানের নামই শিক্ষা। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এবং ইহার সহিত ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক কোথায় ?

আর্য্যসভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ধর্ম্মই ছিল ভারতের প্রাণ। তাই শিক্ষা ও সাহিত্যের মধ্যেও জ্ঞাতসারে বা অলক্ষ্যে ইহার ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছিল।

যাহা মানবকে ও মানবসমাজকে ধারণ করে অর্থাৎ যাহা সত্য ও নিত্য, যাহা শাশ্বত কল্যাণের পথে মানবকে ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম, সুতরাং বর্ত্তমানে ধর্ম্ম যেরূপ একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, পূর্বে সেরূপ ছিল না, কিন্তু আজ দেখিতেছি যে শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে ধর্ম্ম ক্রমশই দূরে সরিয়া যাইতেছে। শিক্ষার সহিত যেন মানব-ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই—ইহা যেন একটি বিলাসের সামগ্রী। কিন্তু সত্যই কি তাই ? অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, যাহার সাহায্যে মানুষ জীবনযাত্রায় পূর্ণ সাফল্য ও গরিমা লাভ করিতে পারে, তাহারই জন্য ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিনা কারণে মানবসমাজের উপর

ধর্ম্ম রুক্ষমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে না—সমাজ-বন্ধন, শৃঙ্খলা ও শান্তি-বিধানই তাহার সত্তার উদ্দেশ্য। তাই মানুষের জীবনে ইহা পরম পাথেয়। চলাচলের পথে যে দিকেই তাকাই না কেন, গ্রহতারা হইতে সুরু করিয়া প্রকৃতির প্রতিটি প্রাণী ও বস্তু, স্থাবর ও জঙ্গম একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম মানিয়া চলিতেছে। এই ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিলে যে কি ভয়াবহ পরিণতি ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ যে শিক্ষা ভাবীকালের আশাস্থল ছাত্রগণের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে, তাহা ভিত্তিহীন ও ত্রুটিপূর্ণ। এমন কি তাহা বাস্তব রাজ্যের পক্ষেও যথেষ্ট নহে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বুকে শান্তিময় জীবন যাপন করিবার পক্ষেও যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহার বড় অভাব থাকিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষা কেবল প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এক অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেছে। ফলে মানব হৃদয়ের সম্পদ হারাইয়া জ্ঞান-সম্পদ বলিয়া আবর্জনা সঞ্চয় করিতেছে—হীরা ফেলিয়া কয়লা কুড়াইতেছে। কেবল তাহাই নহে, যে বাল্যশিক্ষার ভিত্তিতে আমাদের মানবত্বের স্ফুরণ হইবে, তাহাই ত্রুটিপূণ ও সঙ্কীর্ণ—ফলে মানুষে মানুষে এই প্রচণ্ড হানাহানি, এই বীভৎস রক্তপাত।

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে, একে একে জীবনের মধ্যে শিক্ষার ফলে সে আপন অস্তিত্ব অনুভব করে, সৃষ্টিবৈচিত্র্য

আপনার অনুকূলে আনিবার জন্য সজাগ হয়। তাই যে ধর্ম্ম মানিয়া সমস্ত কিছুই আবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার মূলে যে সব রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে, তাহারই উন্মোচনের জন্য মানবচিত্তে কৌতূহল জাগে।

তাহার ফলে বিজ্ঞান জন্ম লয়। তাই দেখা যায় যে. বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে একটি অলক্ষ্য যোগাযোগ বিদ্যমান। বস্তু বা প্রাণিধর্ম্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে আপনার অনুকূলে নিয়োজিত করিবার পথে যাহা সহায়তা করে, তাহাই বিজ্ঞান। ধর্ম্মের ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে বিরোধ প্রতীয়মান হয়, তাহা আপাতদৃষ্ট।

আজ বিভ্রান্ত মানবসমাজ দিশাহারা হইয়া যে পথে চলিয়াছে, তাহা এই সম্পর্ক নির্দ্ধারণের অক্ষমতার পরিচায়ক। এবিষয়ে সচেতন হইলে, ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলে যে অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সঙ্কীর্ণতা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, তাহার অবসান হইবে—পৃথিবীতে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিবে।

(ঘ) শিক্ষা ও দর্শন

ধর্ম্মের সংজ্ঞা লইয়া বিভ্রাট উপস্থিত হইলেও ইহার সহিত যে মর্ম্মের সম্পর্ক আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের বিধান, অনুশাসন সবই মানবের বৃহত্তর স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া। তাই যুগে যুগে হইয়াছে কত মহাপুরুষের আবির্ভাব। চলচপল

জগতে স্থির থাকিবার নিয়ম নাই। তাই সমাজের রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন দর্শনের বাহ্যিক রূপেরও পরিবর্ত্তন ঘটে—নব ধর্ম্মানুশাসন ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন দেখা যায়। কিন্তু যাহা মানবের শাশ্বত ধর্ম্ম তাহার পরিবর্ত্তন নাই—সেই মহলে ধর্ম্মের সহিত মর্ম্মের এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র বিদ্যমান। যখনই মানবের অন্তরাত্মার অবমাননা দেখা দিয়াছে—যখনই মানবত্ব মানুষের হাতেগড়া ধর্ম্মের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, বিশ্বের ইতিহাসে সেই যুগসঙ্কটের মুহূর্ত্তে এক এক মহামানবের আবির্ভাব দেখিতে পাই। নানা সভ্যতার লীলাভূমি ভারতের মাটিতে বিভিন্ন জাতির অভ্যুদয় ও লয় সম্ভবপর হইয়াছে—বিচিত্র মতবাদ নব নব ধ্যান-ধারণা—বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য হইতে সুরু করিয়া শ্রীঅরবিন্দ যুগে যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক একটি প্লাবন আনিয়াছেন।

সুদূর অতীতকে বাদ দিলেও এ যুগের বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি ও অরবিন্দের নাম কে না জানে? ইঁহারা প্রত্যেকেই ভারতের তথা বিশ্বের গগনে এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। মনে হইতে পারে যে এই সব মনীষীর অবদানের সহিত শিক্ষার সম্পর্ক কোথায়—ইঁহারা ত প্রত্যেকেই ধর্ম্মগুরু কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে শিক্ষা ও ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য অতি অল্প। উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দিষ্ট পথ একই দিকে—উভয়েরই সার্থকতা মানবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে।

এই দিক্‌ দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে একের মধ্যে আর একটি নিহিত—উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট হইতে পারে।

বীজ ও অঙ্কুর, ধ্যান ও ধারণার মধ্যে যে সম্পর্ক ধর্ম্ম ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক অনুরূপ বলিলে হয়ত ভুল হইবে না।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে কেহ বা ধর্ম্মকে কেহ বা কর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক একটি বাণীমূর্ত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তাই বিবেকানন্দ কেবল ধর্ম্মজগতে যুগান্তর আনয়ন করেন নাই, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান অসামান্য। তিনি যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন তাহা প্রকৃত মানুষ গড়িবার শিক্ষা। মানুষের মধ্যে যে পূর্ণত্ব সুপ্ত আছে তাহার বিকাশ সাধনই যে প্রকৃত শিক্ষা ইহাই ছিল স্বামীজির শিক্ষা সম্পর্কে একমাত্র নির্দ্দেশ। কর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া জনসেবার মধ্য দিয়া নরনারায়ণের অস্তিত্ব অনুভব করার মধ্যেই শিক্ষার বীজ উপ্ত হইতে পারে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়ে স্বামীজির স্বপ্ন ও ধ্যানমূর্ত্তি অনুপম ও উজ্জ্বল।

বিবেকানন্দের তিরোভাবের পর অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। বর্ত্তমান যুগে অরবিন্দ সত্যই বিশ্বগগনের ধ্রুবতারকা—ভারতের অন্তরাত্মার মূর্ত্ত প্রতীক। ভারতের ক্লিষ্ট আত্মার মুক্তির সন্ধানে তাঁহার প্রতিভার স্ফূরণ হয় নাই—হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে শিক্ষাকে সংহত রূপ দেওয়াই তাঁহার সাধনা। স্বামীজির

অগ্নিময়ী বাণী মানবের সুপ্ত প্রাণে জাগরণ আনিয়াছে; অরবিন্দ তাহাকে অপরূপ ভাবমূর্ত্তি দান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"পরমদেবতাকে জীবনে ফুটিয়ে তোলাই মানুষের লক্ষ্য।" আমাদের শিক্ষাকে, জীবনযাত্রাকে আধ্যাত্মিক সুরে ঝঙ্কৃত করিয়া এক নূতন মহত্তর ও উজ্জ্বলতর সন্ধানের মধ্য দিয়া এক উচ্চতর চেতনার উন্মেষসাধনই ঋষি অরবিন্দের আরাধনা। ভারতের সনাতন আত্মিক শক্তির পরিপূর্ণতার অমোঘ ইঙ্গিতকে কেন্দ্র করিয়া জীবন ও চিৎশক্তির মধ্যে স্বর্ণসেতু রচনা করা অরবিন্দ-দর্শনের মূল কথা।

যাহা কর্ম্ম ও ধর্ম্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাকে জীবনের দর্শনরূপে সঞ্চারিত করিয়াছেন এই মহামনীষী। কিন্তু তাই বলিয়া যেন মনে না হয় যে অরবিন্দ অন্যান্য ঋষিদের ন্যায় আত্মকেন্দ্রিক তপস্যায় মগ্ন,—তাঁহার সাধনা ও আরাধনা ভারতের কল্যাণের জন্য—বিশ্বমানবের মঙ্গলের জন্য।

তাই বিশ্বকবি বা রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের উদ্দেশে প্রণতি জানাইয়াছেন—"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"।

এই লোকোত্তর পুরুষের তপস্যার নিকট রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রণতি স্বীকার করিয়া আপনাকে সার্থক করিয়াছে।

যুগতপস্যার পরিণতি রবীন্দ্রনাথ—তাঁহার প্রতিভার স্পর্শে সমস্তই যেন সজীব ও সাবলীল হইয়া উঠিয়াছে। তাই দেখি যে কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথের অবদান শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার সাধনাকে ম্লান করিয়া দেয় না, বরঞ্চ কি কাব্যে, কি উপন্যাসে

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে উজ্জ্বল রূপে দেখা দিয়াছেন। কেবল কাব্য উপন্যাসের মধ্য দিয়া নহে—শিক্ষা-জগতে তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে আপনাকে বিলীন করিয়া দিয়াছেন—শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার পরিকল্পনা সত্যই সারগর্ভ ও অনুকরণীয়। কেবল জ্ঞানের অনুশীলনই তাঁহার মতে যথেষ্ট নহে—শিক্ষাক্ষেত্রে বোধের তপস্যা একান্ত অপরিহার্য্য। প্রকৃতিকে ঘিরিয়া, মমত্ববোধের মধ্য দিয়া, রূপ, রস ও ছন্দের সাহায্যে যে শিক্ষা শিশু-মনে সঞ্চারিত হয় তাহার একান্ত অভাব। আজ জীবনের সহিত শিক্ষার যোগসূত্র যে বিচ্ছিন্ন তাহার কারণ প্রকৃত শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষকের অভাব।

যাহা বাস্তবের বুকে সৃষ্টির সংকেত রাখিয়া যাইতে পারে না, যাহা জীবনে পূর্ণত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ তাহার সহিত কখনও আপোষ করেন নাই।

আজ বিশ্বের বুকে যে তীব্র হানাহানি, যে বিকৃতি—তাহা এই কুশিক্ষারই বিষময় পরিণতি।

আর একজন মনীষীর প্রাণ শিক্ষার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাই তাঁহার হৃদয়-বীণায় চিরদিনই অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী অনুরণিত হইয়াছে।

এই মহামানব গান্ধীজির ভাবধারা এক অভিনব অলৌকিক সুরে স্পন্দিত। ইংরাজীতে একটি কথা আছে "Great men think alike". সত্যই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রীতি যেখানে জগৎবাসীর প্রাণে প্রাণে মিলনের রাখী পরাইতে আকুল

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

যেখানে গান্ধীজি মানব-সমাজকে অহিংসার মূল মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে দৃঢ়সংকল্প। সহযোগিতা ও ফলপ্রসূ কর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া গান্ধীজির শিক্ষার বুনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে—অন্য দিকে ললিতকলা ও সৌন্দর্য্যপিয়াসী মনকে লইয়া সৃষ্টির আনন্দে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা উজ্জ্বল রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উভয়ের কেহই কর্ম্ম ও ধর্ম্মকে ও সবার উপর জীবনকে শিক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। *

(৬) শিক্ষা ও সমাজ

আদি সভ্যতার যুগ হইতে বর্ত্তমান জীবনায়নের বৈচিত্র্যময় স্তর পর্য্যন্ত মানুষ যে ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার দিকে নূতন করিয়া দৃষ্টিপাত করিবার অবসর আছে।

সৃষ্টি ও ধ্বংস, উত্থান ও পতনের প্রবৃত্তি যেন মানবের অবচেতন মনে একই সূত্রে গ্রথিত থাকে। তাই দেখা যায় যে কখনও সৃজনের আকুল উন্মাদনায় মানুষ নব নব সমাজের সৃষ্টি করে, আবার কখনও প্রলয়ের উৎকট নেশায় সে যেন আত্মবিস্মৃত হয়।

কখনও মানবের হৃদয়দেউলে যে দেবত্বের উদ্বোধন হয় তাহাকে ঘেরিয়া আরতি-উৎসব চলিতে থাকে, আবার কখনও সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া প্রচণ্ড হানাহানি ও তীব্র বিদ্বেষ দেখা দেয়। তবে কি সভ্যতার কোন ক্রমপরিণতি ও নিজস্ব ধারা নাই—ইহা

* প্রবন্ধটি "বাংলার শিক্ষক" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

684

E/44

কি কেবল খেয়ালী মানবপ্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে? আপাতদৃষ্টিতে তাহাই মনে হয়। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে এই খেয়ালী প্রকৃতির অন্তরালে একটি উদ্দিষ্ট গতিপ্রথ বা সরণি বিদ্যমান। নদী যেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া কত পল্লীতে কলধ্বনি শুনাইয়া, কত প্রান্তরকে শস্যশ্যামল করিয়া, কত বনবীথির বারতা বহন করিয়া অসীম সাগরের অভিমুখে ছুটিয়া চলে, সেইরূপ সভ্যতারও একটি বঙ্কিম ছন্দোময় প্রবাহ আছে।

এই স্রোতস্বিনীর তটে গড়িয়া ওঠে কত শত জনপদ ও নগরী, আবার শ্মশান ও সমাধিস্থান; সেইরূপ সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে কখনও ঘোষিত হয় প্রীতি ও মৈত্রীর জয়গান, কখনও বা রণভেরীর প্রচণ্ড নিনাদে কূল-উপকূল মুখর হয় পশুত্বের প্রকাশে; ক্ষণিকে মানবত্ব দূরে বিদায় নেয় প্রকৃতির রাজ্যে এই ভাঙ্গাগড়ার কামাই নাই। সভ্যতার এই উত্থান-পতন, নিলয়-অভ্যুদয়ের মূলে একটি জৈবিক সত্তা যেন কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। শিক্ষা এই সত্তাকে পরিমার্জ্জিত করে। আবার সমাজের পটভূমিকায় এই শিক্ষার রূপায়ণ নির্ভর করে। তাই সমাজগঠন ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক্ আলোচনা না করিলে ইহার সহিত শিক্ষার যোগাযোগ নিরূপণ করা কঠিন।

সমাজ ও সমাজের উপাদান

সমাজ বলিলে কেবল একটি জনসমষ্টিই বুঝায় না, অধিবাসিগণের মধ্যে আচরণ, রুচি, চিন্তাধারার সামঞ্জস্য সমাজের

S.C.E.R.T., W.B. LIBRARY
Date 19.11.2001
10284

আবশ্যিক উপাদান। একটি স্থায়ী সম্পর্ক যখন সমাজের সদস্যদের মধ্যে গড়িয়া ওঠে তখনই তাহাকে প্রকৃত সমাজ আখ্যা দেওয়া যায়।

(১) অধিবাসী

আজ যে মানবসমাজের বিভিন্ন রূপ দেখা যায় তাহা একটি ক্রমবিবর্ত্তনের রূপায়িত পরিণতি। যে জনসমাবেশ সমাজের মূল উপাদান গঠন করে তাহা যে সর্ব্বদাই বংশবৃদ্ধির পরিণতি তাহাই নহে, বহুস্থান হইতে আগত মানবগোষ্ঠী ক্রমশই একই সমাজে লীন হইতে থাকে ও ক্রমশই তাহারা অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হইয়া যায়। অনেক সময় দেশের শিল্প ও উপজীবিকা, সম্পদ ও প্রকৃতি অনুযায়ী এই জনসমাবেশে তারতম্য ঘটিতে থাকে। কৃষিকার্য্য এই সমাবেশকে সুবিন্যস্ত করিতে সহায়তা করে, কারণ অধিবাসীদিগকে সমানভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া প্রত্যেক অঞ্চলেই কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে। অন্যান্য শিল্প অধিবাসীকে অন্যস্থান হইতে আকর্ষণ করিয়া কেন্দ্রস্থ করিবার প্রয়াস পায়। যে স্থলে অধিবাসী মোটামুটি জন্মগত অর্থাৎ একই পরিবার হইতে ক্রমবর্দ্ধিত সে স্থলে একটি সাধারণ ধারা, রুচি ও সংস্কৃতি লক্ষিত হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে শিক্ষার আয়োজন, শিক্ষাপদ্ধতি বৈচিত্র্যহীন ও সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। অন্যদিকে যেখানে অধিবাসীসংখ্যা প্রচুর ও বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন সে স্থলে শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষাপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীও

বৈচিত্র্যময় ও ব্যাপক হয়। তাই দেখা যায় যে অধিবাসীর সংখ্যা ও প্রকারভেদের সহিত শিক্ষাপরিকল্পনার একটি নিবিড় যোগসূত্র আছে।

(২) আঞ্চলিক পরিবেশ

অধিবাসীর ন্যায় আঞ্চলিক পরিবেশেরও শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবের সহিত পা ফেলিয়া শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রকল্পকে অগ্রসর হইতে হইলে আঞ্চলিক প্রভাবকে উপেক্ষা করা যায় না।

জলবায়ু

জলবায়ু, নৈসর্গিক প্রভাব যেমন মানবের দেহ ও আকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে সেইরূপ মনের উপরও ইহার প্রভাব উপেক্ষণীয় নহে।

সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেও জলবায়ুর বিশেষ মূল্য আছে। যেখানে জলবায়ু কখনও শৈত্য ও কখনও উষ্ণতাবাহী সেখানে সমাজব্যবস্থাও বৈচিত্র্যময় হইয়া ওঠে। সাধারণতঃ শীতপ্রধান দেশে যেখানে রাত্রি দীর্ঘ সেখানে গৃহাভ্যন্তরীন কর্ম্মসূচী ও কুটীরশিল্প সমৃদ্ধ হয়, মানুষ পরিশ্রমী হয়, কিন্তু উষ্ণপ্রদেশের অধিবাসী শ্রমবিমুখ হইয়া থাকে। জলবায়ু অনুযায়ী অধিবাসীর সংখ্যা ও প্রকারভেদ নিয়ন্ত্রিত হয়। অত্যন্ত উষ্ণদেশের শিক্ষা সাধারণতঃ মন্থরগতিতে প্রসার লাভ করে। বিদ্যালয়ের

অবকাশ, পাঠ্যসূচী ও সময়তালিকার সহিত জলবায়ুর বিশেষ সম্পর্ক আছে।

(৩) **মানবপ্রকৃতি ও সমাজচেতনা**

জাতিগত বৈশিষ্ট্য ভিন্ন মানবপ্রকৃতি এবং স্বাতন্ত্র্যও শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সর্ব্বদাই একটি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস ও সুবিধা অন্বেষণের প্রচেষ্টা সভ্যতাবিস্তারের মূলে কার্য্য করিয়াছে। তাই দেখা যায় যেখানে খনিজ পদার্থের প্রাচুর্য্য ও জলবায়ুর স্নিগ্ধতা ও বৈচিত্র্য সেইখানেই মানুষ ঘন বসবাস করিয়া কৃষি ও জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়াছে, কোথাও বা শিল্পসৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে। জ্ঞান আহরণের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মানবপ্রকৃতিরই বিশেষ পরিণতি।

(৪) জাতিগত বৈশিষ্ট্য

অন্ধ সংস্কার

লোকাচার ও সামাজিক প্রথা

ধর্ম্ম ও মতবাদ

রাজনীতি এবং অন্যান্য দিক

সংস্কার

ইহা অনেক সময় শিক্ষাযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে। সংস্কার ও ঐতিহ্য অনুযায়ী শিক্ষাপ্রকল্প বিভিন্ন রূপ লয়। অনেক সময় সংস্কার শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে এবং একটি বাঁধা খাতে শিক্ষার ধারাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে। আবার অনেক

সময় একটি বিশেষ সংস্কার শিক্ষার্থী ও দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতিবিধানে সহায়তা করিয়া থাকে।

লোকাচার ও সামাজিক প্রথা

লোকাচার ও সামাজিক প্রথার মূল্যও শিক্ষাজগতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়; সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করিতে ও পারস্পরিক কর্ত্তব্যবোধকে জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় লোকাচার ও জনপ্রথার উদ্ভব হয়, কিন্তু কালের আবর্ত্তনে যে লোকাচার সমাজের কল্যাণের জন্য উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা বিকৃত হইয়া পড়ে। ফলে শিক্ষার লক্ষ্য ও সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

ধর্ম্ম ও মতবাদ

অনেক সময় দেখা যায় যে এক একটি গোষ্ঠীর মধ্যে এক এক প্রকার নীতি ও ধর্ম্ম প্রবল। কেহ বা অহিংসা ও ক্ষমা কেহ বা শক্তি ও সাহসের ভিত্তিতে জীবনের নীতি ও ধর্ম্ম গড়িয়া তোলে। কেহ সেই অলক্ষ্য শক্তির উদ্দেশ্যে প্রণতি জানায়, আবার অনেকে সেই বিপুল সত্তাকে বিশ্বচরাচরের বুকে প্রতিফলিত দেখে ও সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করে। যেখানে ধর্ম্ম উদার ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেখানে শিক্ষার পরিণতি সুফলপ্রসূ হয়—কি বিদ্যানিকেতনে, কি সমাজ জীবনে একটি স্নিগ্ধ প্রীতির সৌরভ বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। কিন্তু যেখানে শক্তির স্পর্দ্ধা ও সাহসের উপর ভিত্তি

করিয়া ধর্ম্ম ও জাতীয় মতবাদ গড়িয়া ওঠে সেই সমাজের শিক্ষা-নীতিও অনুরূপ উগ্রতা ও মত্ততা আনিয়া দেয়, কিন্তু সংগ্রামময় জগতে বাস্তবের সহিত যুদ্ধ করিবার সাহস সঞ্চয়ে সহায়তা করে। রাজনীতি ও রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য।

(৫) ভাববিনিময়ের বাহন ও যানবাহন

শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের পথে যে কোন বাহনেরই প্রভাব অপারিসীম। ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মাধ্যমের একান্ত প্রয়োজন। যতই এই মাধ্যমের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হয় এবং বাহন উন্নত ও সহজলভ্য হয় ততই শিক্ষার ব্যাপকতা লাভের সম্ভাবনা। লিপি হইতে সুরু করিয়া বৈজ্ঞানিক-যুগের পরম অবদান বেতারযন্ত্র পর্য্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। পূর্ব্বে যে বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য বিদ্যার্থীকে গুরুগৃহে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া স্মৃতিশক্তির সাহায্যে অধিগত বিদ্যাকে সঞ্চারিত করিতে হইত, বর্ত্তমানে নূতন নূতন গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ, বেতার বক্তৃতা, শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র সেই বিদ্যার প্রসারকে সহজসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। যানবাহন মানবকে শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগের সুযোগ করিয়া দেয়, শিক্ষার আলোকে ধন্য হইতে সহায়তা করে। তাই দেখা যায় যে, যে যে উপাদান লইয়া সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় ও সমাজের সহিত যাহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ তাহাদের প্রত্যেকেরই শিক্ষার সহিত সম্পর্ক আছে।

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANKURA

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(ক) শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য উভয়কে পৃথক করিয়া দেখা যায় না, একটির সহিত অপরটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সভ্যতার বিবর্ত্তনের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজন কখনও অস্বীকৃত হয় নাই—তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য লইয়া মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। দেখা গিয়াছে সমাজের প্রভাব যেমন সাহিত্যকে মানিয়া লইতে হয় সেইরূপ শিক্ষা জগতেও তাহার প্রতিফলন অনিবার্য্য।

শিক্ষাকে কেবল তথ্য পরিবেশনের দ্বারা মনকে ভরপূর করিয়া তুলিবার নামান্তর বলা চলে না—ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়া জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের নামই শিক্ষা। কিন্তু জীবন বলিতে অনেক কিছুই বুঝায়। দেহ, হৃদয় ও মস্তিষ্কের পরিপুষ্টির দিক হইতে অনেকেই শিক্ষাকে তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে শিক্ষা একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

অন্যদিকে নান (Nunn) প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ শিক্ষার সহিত শিক্ষণ ও শিশুমনস্তত্ত্বের নিবিড় সম্পর্ক দেখিতে পাইয়াছেন।

তাঁহার মতে শিশুর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পর তদনুযায়ী চেতনা ও জ্ঞানের উন্মেষণার কার্য্যই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য এবং জীবনের পরিপূর্ণতা বিধান শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে কখনও বা সংকীর্ণ প্রয়োজন-বোধের দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আবার কখনও বা বৃহত্তর আদর্শের সুর শিক্ষার মধ্যে অনুরণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ শিক্ষাকে অভাবমোচনের প্রতি উদ্দিষ্ট করেন এবং বাস্তবের রাজ্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্পণ করাও যে ইহার প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। জীবনের ধ্যানধারণার দিকেও যেমন শিক্ষার দায়িত্ব আছে আবার ক্রিয়াকুশলতা ও কর্ম্মনৈপুণ্য সম্পর্কেও শিক্ষাকে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। বরঞ্চ তাহাদের মতে—বাস্তবের সহিত সংগ্রামে মানুষকে যোগ্যতর করিয়া তোলা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

আবার দেখা যায় যে, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে নিয়ন্ত্রিত হয়। নাগরিক সৃষ্টি করাই নাকি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য—এমন কি রণাঙ্গনের সৈনিক প্রস্তুত করাও দেশবিশেষের নিকট শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে বিবেচিত হইয়াছে। তাই জাপান, জার্ম্মান ও স্পার্টার শিক্ষা পরিকল্পনা যে একটি বিশেষ দিকে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই।

রাষ্ট্র ও ঐহিক জীবনের ঐশ্বর্য্য-বৈভবের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের শিক্ষা-প্রকল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল।

অন্যদিকে চীন ও এথেন্সের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় তাহাদের শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি, আধ্যাত্মিকতা ও সূক্ষ্মতর জীবনের আস্বাদনই প্রবল রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে।

বিশ্লেষণের দ্বারা ইহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয় যে. কোন কোন দেশ কেবল বুদ্ধির উন্মেষ সাধনকেই শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহ বা দেহচর্চ্চা ও শারীরিক শক্তির বিকাশকেই ইহার অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, আবার কতিপয় দেশ হৃদয়ের সম্পদ ও আধ্যাত্মিকতার দিকেই বিশেষ সজাগ।

কিন্তু কোন একটি বিশেষ দিকই যে শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারে না, ইহা সুস্পষ্ট। নানারূপ বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ইহা ক্রমশঃই পরিণতি লাভ করিতেছে।

তাই দেখা যায় যে, শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে এখনও বিশেষ মতৈক্য না থাকিলেও কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রায় প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে, যাহা মানুষকে পরিবেশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণের পথে সহায়তা করিতে পারে এবং বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে যোগ্যতা আনিয়া দেয় তাহাকেই শিক্ষা বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না। অবশ্য ডিউয়ি প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ জীবনের সহিত শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করিয়াছেন,

তাঁহার মতে জীবনই শিক্ষা এবং এই শিক্ষার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিণতি বা লক্ষ্য নাই—কালের প্রবাহের সহিত শিক্ষা-জগতেও ক্রমশঃ রূপান্তর ঘটিতেছে এবং ইহাও ক্রমশঃই পরিণতি লাভ করিতেছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিশেষ প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই সমাজের মধ্যে ব্যক্তিজীবনের স্ফুরণ ও পরিপূর্ণ বিকাশ শিক্ষা-প্রকল্পে স্বীকৃত হওয়া উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, মানব সামাজিক প্রাণী—তাই সমগ্র সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিকট নতি স্বীকার করিতে পারে না। মুক্তি বা স্বাধীনতাই যে কল্যাণের প্রকাশ ইহা স্বীকার করিলে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা সামাজিক কল্যাণ কোনটির প্রতিই উদাসীন থাকা উচিত নহে। কারণ ব্যক্তিগত জীবনের সমৃদ্ধি ও পূর্ণতাই সমাজকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারে। ব্যষ্টি লইয়াই যে সমষ্টি একথাও যেমন বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে, আবার সমষ্টি বা সমাজকে ব্যক্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিরূপ হইলেও চলিবে না।

মোট কথা শিক্ষা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণের অগ্রদূত। কি ব্যষ্টি, কি সমাজ প্রত্যেকেই শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া পূর্ণতর জীবনের পথে অগ্রসর হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারতের মনীষিবৃন্দ যে আলোক-পাত করিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। সেই প্রাচীনযুগ হইতে গান্ধীজির যুগ পর্য্যন্ত শিক্ষা-জগতে যে অবদান ভারত অর্পণ

করিয়াছে তাহা কোন মতেই উপেক্ষার বস্তু নহে। বরঞ্চ তাহার ধ্যান-ধারণার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ধারা লক্ষ্য করা যায়।

আত্মউন্মোচন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ উভয় দিকেই ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ছিল। আত্মোপলব্ধিও যেমন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যরূপে বিবেচিত হইয়াছে অন্যদিকে আপনার উন্মোচন অর্থাৎ জগতের বুকে আপনাকে উন্মেষিত ও প্রতিফলিত করাও ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

ইহা ছাড়াও সর্ব্বপ্রকার বন্ধন মুক্তিই শিক্ষার চরম পরিণতিরূপে বিবেচিত হইয়াছে,—

'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'।

শরীরের দিকেও যেমন ভারতীয় শিক্ষার ঔদাসীন্য (যথা "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্") ছিল না সেইরূপ বাস্তব কল্যাণের দিকেও ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য সজাগ ছিল এবং পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা সক্রিয় শিক্ষার বিশেষ সমাদরও ছিল। তাই দেখি—

"শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খা
যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স এব"

অথবা

"শ্রিয়ঃ প্রদুগ্ধে বিপদং রুণদ্ধি।"

অর্থাৎ শাস্ত্র পড়িয়াও মানুষ মূর্খ হয়, যে ক্রিয়াবান সেই প্রকৃত

* প্রবন্ধটি "প্রবর্ত্তক" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুরুষ, অথবা শিক্ষা কল্যাণ ও সম্পদ আনয়ন করে, বিপদ রোধ করে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, আধুনিক সভ্যতার ক্ষেত্রে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার মূলে আছে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বিভ্রাট। মনে হয় বর্ত্তমান কেবল হৃদয়ের দিককে উপেক্ষা করিয়া নিছক বুদ্ধিজীবী হইয়া পড়িতেছে। ইহার মধ্যে মানবত্ব ও প্রীতির স্পর্শ নাই। তাই সহযোগিতার পরিবর্ত্তে অমানুষিক প্রতিযোগিতা যেন বর্ব্বর যুগের সূচনা করিয়াছে। শিক্ষাকে এইরূপভাবে উদ্দিষ্ট করা উচিত যাহাতে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মধ্যে একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে—সমগ্র মানবকে লইয়া যে সমাজ গড়িয়া উঠিবে তাহাতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তবেই মাটির পৃথিবীতে সেই স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে—তবেই মানুষে মানুষে সংগ্রাম, মানবত্বের মহীয়ান্ আদর্শের নিকট অনর্থ পরাজয় স্বীকার করিবে।

(খ) শিক্ষা-পরিক্রমা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড ও মানবসভ্যতার মাপকাঠি। তাই বিশ্বের ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে দেখা যায় যে দেশের প্রতিটি জাগরণের মূলে আছে শিক্ষাসংস্কার। এই জ্ঞানযজ্ঞের আয়োজনে শিক্ষকগণই হোতা, কিন্তু ভারতে শিক্ষকগণের

অবস্থার কথা চিন্তা করিলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয়।

আজ ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতার সূর্য্যোদয় হইয়াছে সত্য, শতাব্দীর পুঞ্জীভূত তমসার ঘোরও কাটিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে আশার উদয় হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও কুহেলিকা। ভারতের অতীত গরিমার কথা বলিবার মত স্পর্দ্ধা আর নাই—তপোবনের আদর্শ আজ স্বপ্নরাজ্যের কথা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তবুও মনে হয় যে এই বিকট সভ্যতার দিনেও অনুরূপ আদর্শ ভিন্ন 'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়'। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানারূপ ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়া আজ আমরা যে স্তরে উপনীত হইয়াছি তাহার পরিণতি নিরূপণ করা কঠিন। তবে যখন যাঁহারা ভারতের ভাগ্যাধিনায়ক হইয়াছেন তখন শিক্ষা-যন্ত্রটি তাঁহাদেরই স্বার্থান্বেষী দৃষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সেখানে ব্যাহত হইয়াছে। তাই বিগত দুই শতাব্দীর পরাধীনতার অনুতাপে-ভরা ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিতেছে। বৃটিশরাজ আমাদের এতদিন যে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন তাহাকে "দপ্তরী (দপ্তরের উপযোগী) বিদ্যা" বলিলেও বিশেষ ভুল হয় বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিমের কাছে পূবের ঋণ কিছুই নাই তাহা বলিতে চাহি না, তবে পাশ্চাত্য আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছে তাহার আলোকের মধ্যে প্রদীপনের শক্তি অপেক্ষা দাহিকা শক্তিই প্রবলতর। তাই ত' দেখি আজ ভারতের

মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় গর্ব্বভরে আপনাদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়া চলিয়াছে—মানবত্ব কত বিকৃত শিক্ষার অন্তরালে গুমরাইয়া মরিতেছে। যেখানে অন্যান্য দেশে গণশিক্ষার জন্য প্রয়াস ও আয়োজনের অন্ত নাই সেখানে ভারতে মতবাদের তুফান ও শূন্যগর্ভ পরিকল্পনার মরীচিকা শিক্ষাতরণীকে তীর হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। অনেকে হয়তো ইহার প্রতিপক্ষে বলিবেন যে সমস্ত সমস্যার সমাধান সময়সাপেক্ষ, কিন্তু প্রকৃত সমাধানের দিকে উদাসীন থাকিয়া সমস্যাগুলিকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ফেলিয়া রাখাকে 'জাগিয়া ঘুমান'র নামান্তর বলা যাইতে পারে। "আজ ভারতের ঘরে ঘরে হাহাকার ও হানাহানি শিক্ষাকে দূরে সরাইয়া দিতেছে—মানুষ জীবনধারণ করিলে তবে ত শিক্ষা" প্রভৃতি কথা আজ অনেককে বলিতে শুনা যায়। কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে কথাটির মধ্যে যুক্তি বিশেষ নাই। যদিও দেশের ভাগ্যের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির বিশেষ যোগাযোগকে অস্বীকার করা যায় না, তবুও একথা বলা ভুল যে শিক্ষার সহিত জীবনায়নের কোন সম্পর্কই নাই।

মানুষের চিত্তবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য বটে—কিন্তু জীবনের অভাব ও অনটন, দৈন্য ও দারিদ্র্য মোচন করিবার কোন দায়িত্বই কি শিক্ষার নাই? শিক্ষার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, তবে সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের দৈন্য ও গ্লানি দূর করিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের সন্ধান দেওয়াই ত' শিক্ষার

অন্যতম উদ্দেশ্য। তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে—তবে আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ করিতে অক্ষম কেন!—কোথায় ইহার ত্রুটি ও সমাধান! তাই প্রথমে সমস্যাগুলির ক্রমবিশ্লেষণ করিয়া পরে সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করিব।

সমস্যাগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া পবিত্র বিদ্যামন্দিরে বাণী-প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় তাহাদের মধ্যে সম্পর্কবিভ্রাট ঘটিয়াছে। শিক্ষার উপাদানগুলির মধ্যে যদি বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, যদি তাহারা পরস্পরবিরোধী হইয়া পড়ে, তবে প্রকৃত জ্ঞানোদয়ের আশা কোথায়?

প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর কথা ধরা যাউক, কারণ শিক্ষার্থীর জন্যই সমস্ত প্রকার উদ্যোগ ও আয়োজনের সার্থকতা।

শিক্ষার্থীকে যাহাদের সংস্পর্শে আসিতে হয় তাহারা যথাক্রমে—(১) শিক্ষক (২) পাঠ্যগ্রন্থ (৩) বিদ্যালয় (৪) অভিভাবক ও (৫) সমাজ।

শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করিয়া যে সম্পর্কবিভ্রাট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার কারণ ও সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পৃথকভাবে করিবার ইচ্ছা আছে। তবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণের মধ্যে যে শ্রদ্ধার মধুর সম্পর্ক লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহার জন্য ছাত্রগণ অপেক্ষা অপর পক্ষই দায়ী।

অবশ্য বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও সমাজব্যবস্থাও ইহার জন্য আংশিকভাবে দায়ী তাহা অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয় বিভ্রাট হইতেছে শিক্ষককে কেন্দ্র করিয়া। যথা—

(১) শিক্ষক ও সমাজপরিবেশ।

(২) শিক্ষক ও অভিভাবক।

(৩) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী।

(৪) শিক্ষকের শিক্ষা।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে শিক্ষক ও সমাজ-পরিবেশ এবং শিক্ষক ও অভিভাবকগণের মধ্যে নিবিড় এবং অনুকূল সম্পর্ক না থাকায় বহু অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে।

বস্তুতঃ অর্থের মাপকাঠিতে সর্ব্বত্রই আজ যে মূল্য নিরূপণের প্রবৃত্তি প্রকট তাহাই সমাজে শিক্ষকের আসনকে বহু নিম্নে নামাইয়া দিয়াছে। আবার শিক্ষক ও অভিভাবকগণের মধ্যেও যে যোগাযোগের অভাব ঘটিয়াছে তাহা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কের মাধুর্য্যকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে। আজ অভাবের তাড়নায় শিক্ষকের স্বভাব পর্য্যন্ত হীন হইতে বসিয়াছে—শিক্ষার পবিত্র আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহারা শিক্ষার নামে ব্যবসা শুরু করিতে প্রণোদিত হইয়াছেন, ফলে তাঁহারা যেরূপ সমাজে বিশেষ কোন অবদান অর্পণ করিবার প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়া অন্নসংস্থানের জন্য বিবিধ গ্লানিকর উপায় অবলম্বন করিতেছেন, সেইরূপ সমাজেও শিক্ষকের প্রয়োজনবোধ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া

আসিয়াছে—ইহার জন্য দায়ী কে এবং এই সমস্যার সমাধান কোথায় প্রভৃতি প্রশ্নের আলোচনা পৃথকভাবে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় কথা পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারণ। দেখা যায় যে যে সব গ্রন্থ ছাত্রগণের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করা হয়, তাহা ছাত্রগণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করে না এবং বাস্তব জীবনেও কোন নির্দ্দিষ্ট পথের নির্দ্দেশ দেয় না। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। গ্রন্থগুলির মধ্যে জীবনরসের অভাব এবং শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তির প্রতি ঔদাসীন্যই এই শোচনীয় পরিণতির মূল কারণ। আনন্দরসের কার্পণ্য এবং তত্ত্বকথার প্রাচুর্য্যই ছাত্রচিত্তকে পরাঙ্‌মুখ করিয়া দেয় ও তাহার ফলে তাহারা কেবল পরীক্ষা পাশের উদ্দেশ্য লইয়া কোন মতে বিষয়গুলি গরহজম করিয়া পরীক্ষার তারিখ পর্য্যন্ত উদরস্থ রাখিয়া সেই স্মরণীয় দিনে উগ্‌রাইয়া বোঝা হইতে নিষ্কৃতি পায়।

ইহার একমাত্র সমাধান নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রন্থপ্রণয়ন—যাহাতে গ্রন্থের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর চিত্তকে বিকাশের পথে সহায়তা করিতে পারে ও তাহার ভাবী জীবনের পথনির্দ্দেশক হয়।

তাহার পর বিদ্যালয়ের কথা। আজ যে বিদ্যালয় এখনও ভারতের মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থীর জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার ভার নিয়াছে—যাহাতে নির্ধনদের স্থান নাই, তাহাদের অবস্থারও আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের 'ছাত্রধারা' কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি মনে

পড়িয়া যায়। সত্যই যেন বিদ্যানিকেতন আজ কারাগাররূপে প্রতিভাত হয়. ইহার কারণ নিরূপণ বিশেষ আয়াসসাধ্য নহে। বিদ্যামন্দিরে যেন এক প্রাণহীন আয়োজন, এক স্বার্থপূর্ণ বেচাকেনার অভিনয় চলিতেছে। ছাত্রগণ সেখানে যেন গৌণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল রুদ্ধ কারার মুহূর্ত্তগুলি কোনমতে নীরস বস্তু চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিয়া অতিবাহিত করিবার জন্য কিশোর ছাত্রগণ আকুল হইয়া ওঠে। ইহার প্রত্যুত্তরে অনেকে বলিতে পারেন "Spare the rcd and spoil the child"—তাঁহারা বলিতে পারেন যে ছাত্রগণকে যতই স্বাধীনতা ও আরাম দেওয়া যাইতেছে ততই তাহারা উন্মার্গগামী হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু সত্যই রোগ কি এবং কোথায় ইহা বিবেচনা না করিয়া ঔষধের বিধিব্যবস্থা করিলে রোগের উপশম না হইয়া রোগ বৃদ্ধিরই অধিক সম্ভাবনা। মোট কথা, বিদ্যালয়ে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি না হইলে তাহা কখনও আনন্দমন্দিরে পরিণত হইতে পারে না। এবং বিদ্যালয়ে যতদিন আনন্দের মধ্য দিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা না করা যায়, যতদিন বৃহত্তর সমাজের সহিত বিদ্যালয়কে বিচ্ছিন্ন থাকিতে হইবে, ততদিন প্রকৃত শিক্ষার আশা অল্প।

শিক্ষাপদ্ধতি ও পরীক্ষাপদ্ধতির মধ্যেও অনুরূপ ক্রটী লক্ষিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে আসিয়া শ্রেণীর পশ্চাৎভাগে কোনমতে মাথা গুঁজিয়া ছড়া ও নক্সায় খাতা ভর্ত্তি করিয়া, কোলাহল করিয়া শূন্য মনে পুস্তকের বোঝা লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহা হইতে স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়

যে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি ছাত্রচিত্তকে একেবারেই আকর্ষণ করে না। অনেক সময় শিক্ষক মহাশয়গণ দুইবার পাঠ আবৃত্তি করিয়া বক্তৃতা দিয়া ঘণ্টা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী ত্যাগ করিয়া আপন কার্য্যের সমাধান হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের কিশোর অপরিণত ছাত্রদের পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে। তাহাদিগকে ক্রীড়া-কৌতুক ও আনন্দের মধ্য দিয়া সক্রিয়ভাবে পাঠে নিয়োজিত করিতে না পারিলে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়া অসম্ভব। নানা উপায়ে অভিনব অথচ সরস পদ্ধতিতে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া ছাত্রচিত্তকে আন্দোলিত করিয়া তাহাদিগের চিত্তবৃত্তির ক্রমোন্মেষ সাধনই বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পরীক্ষাপদ্ধতিরও আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। আমরা যে মাপকাঠিতে ছাত্রগণের জ্ঞানের মূল্য দিই তাহা নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। এ পর্য্যন্ত কেবল মুখস্থ বিদ্যা ও অন্ধ অনুশীলনের প্রশ্রয় দিয়া ছাত্রদিগের মৌলিকতার দিকে কোন দৃষ্টিই দেওয়া হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসরে প্রবেশিকার বাংলা পত্রে এই গতানুগতিকতার কিছু ব্যতিক্রম আশাপ্রদ।

একটি কথা আজ মনের গহনে বারংবার উঁকি দেয়, যেন শিক্ষার প্রাচীন আদর্শ ও যুগধর্ম্মের মধ্যে একটি কঠোর সংঘাত বারংবার কানাকানি করে—এবং এই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পাক খাইতেছে। তাই আজ ভারতের নূতন পরিস্থিতিতে দেশগঠন, কার্য্যকরী শিক্ষা এবং যান্ত্রিক শিক্ষার সহিত গতানুগতিক একটি মিটমাট হওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

আজ শিক্ষাপরিধিকে প্রসারিত করিয়া বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী করিতে না পারিলে, জীবনের সহিত শিক্ষার সমন্বয় না ঘটিলে ভবিষ্যতের সম্পর্কে আশার কিছুই নাই।

কেবল তাহাই নহে, ছাত্রদের নৈতিক জীবনকেও সমৃদ্ধ করিবার ভার বিদ্যালয়ের ও অভিভাবকগণের যৌথ হস্তে নির্ভর করে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলার প্রয়োজন। কেবল নীতিবাক্য ও তত্ত্বকথায় অহর্নিশ ছাত্রচিত্তকে ভারাক্রান্ত করিলে হিতে বিপরীত হইবারই সম্ভাবনা, কারণ নীতি শিক্ষাদান এমন একটি কঠিন কার্য্য যাহা ঢাক বাজাইয়া প্রচারের দ্বারা সম্ভবপর নহে। শিক্ষার্থিগণের চলচপল চিত্তে আদর্শের স্পর্শ সঞ্চার করিতে হইলে চাই প্রকৃত আদর্শবাদী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ দরদী শিক্ষকের আন্তরিক প্রয়াস।

বিঃ দ্রঃ—প্রত্যেকটি সমস্যা ও সমাধানের বিস্তারিত আলোচনা পৃথকভাবে আলোচিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষার্থী

(ক) শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তি ও শিক্ষা

প্রায়ই দেখা যায় যে, শিশুর মনোরাজ্যের সহিত পরিচয় না থাকিলে শিক্ষাদান-কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয় না।

সাধারণতঃ চলচপল শিশুচিত্তে দুইরূপ প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় লক্ষিত হয় যে, অজানার প্রতি কৌতূহল শিশুর মনকে উচাটন করিয়া তোলে। তাই সেই অজানা রহস্যের দ্বারোন্মোচন করিবার জন্য তাহার কত কি আয়োজন! এই অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সে তন্ময় হইয়া অজানিতের সন্ধানে দুর্ব্বার গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। আবার ইহাও দৃষ্টিপথে আসে যে, শিশুদের যাহা একান্ত পরিচিত, সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহা হইতে শিশুচিত্ত আনন্দরস আহরণের চেষ্টা করে।

কখনও মনে হয়, ইহারা নূতনের পূজারী—আবার কখনও তাহাদিগকে পুরাতনকে আঁকড়াইয়া রাখিতে বিশেষ উৎসাহী দেখা যায়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এই শিশুচিত্তের স্বাভাবিক গতি ও প্রবণতার দিকে সজাগ দৃষ্টির প্রয়োজন। তাহা না হইলে

ভবিষ্যৎ জীবনে ইহাদের অতৃপ্তিব্যাহত বৃত্তি নানা অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয় পথ খুঁজিতে থাকে। অনেক সময় শিশুর অবিরাম প্রশ্ন শিক্ষক ও অভিভাবকগণের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলে—কিন্তু তাহার যখন ধরণীর বৈচিত্র্যের সহিত নূতন পরিচয়, সেই নবীন বয়সে যে ইহা স্বাভাবিক, সে কথা অনেক সময় তাঁহারা বিস্মৃত হন এবং ফলে তাহার এ কৌতূহলের যথাযথ নিবৃত্তি ঘটে না, তাহার ভাবরাজ্যের দৈন্য থাকিয়া যায়।

অন্যদিকে শিশুকে একই ক্রীড়া একই কার্য্য বরাবর অনুশীলন করিতে দেখিয়া অনেকে তাহাকে বিরক্তি ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, অনেকে হয়ত তাহা হইতে শিশুকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যদি আমরা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রতিদিনের কর্ম্মের কথা চিন্তা করি, তাহা হইলে আমাদের ক্রিয়াকলাপও বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে উপহাসের বস্তু হইয়া উঠে। শিশুদের, বিশেষ করিয়া ছোট মেয়েদের, পুতুলখেলা, বাড়ী-বাড়ী খেলা আমাদের সংসারের খেলাধূলার অনুকল্প; এই খেলাধূলার মধ্য দিয়া তাহাদের অনুকরণ-প্রবৃত্তির 'উন্মেষ' হয়। খেলাধূলার মধ্যেই তাহারা বৃহত্তর জীবনের প্রতিচ্ছবি খুঁজিয়া পায় বলিয়া তাহারা বৃহত্তর সংসারের এক একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আত্মপ্রচারের ও প্রাধান্যবিস্তারের প্রয়াস উঁকি দেয়।

শিক্ষাক্ষেত্রেও যথেষ্ট ক্রীড়াকৌতুক, গল্প-ছড়ার ও কর্ম্মানুশীলনের আয়োজন এবং উপকরণ অপরিহার্য্য।

যে প্রাধান্যবিস্তারের চেষ্টা দেশের শ্রেষ্ঠ নেতাদের মধ্যেও দেখা যায়, তাহা ক্ষুদ্র শিশুর মধ্যেও সমভাবে লক্ষিত হয় কারণ ইহা যে মানবমনের ধর্ম্ম। শিশুদের জীবনে এই প্রয়াস ব্যাহত হইলে, তাহা নানাভাবে সহজেই প্রকাশ পায়। তাই অভীষ্টসিদ্ধির পথে সামান্য অন্তরায় ঘটিলেই ইহারা লঙ্কাকাণ্ড সুরু করিয়া দেয়, কিন্তু এই ক্রোধপ্রকাশের ক্ষমতা যে প্রাণশক্তিরই পরিচায়ক, একথা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া গিয়া শিশুর এই বৃত্তিকে প্রকৃত খাতে প্রবাহিত না করিয়া তাহাকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য কৃতযত্ন হই। বিদ্যালয়-জীবনে শিক্ষকগণ এবিষয়ে সজাগ না থাকিলে জাতীয় জীবনেও সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে, ছাত্রদের মধ্যে চুরিবিদ্যা প্রকৃত বিদ্যা অপেক্ষা অধিক আয়ত্ত হইতেছে। অনুধাবন করিলে দেখা যায়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে ছাত্রগণ চুরি করিবে বলিয়া চুরি করে না। ছবি, বই, খেলনা প্রভৃতি যে প্রায়ই চুরি যায় তাহার মূলে আছে সংগ্রহ বা সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। যেখানে যাহা পায়, তাহা কুড়াইয়া লইয়া আপনার বাক্স বা ডালি পূর্ণ করার নেশা তাহাকে এতই পাইয়া বসে যে, এই আহরণের পথে সে পাত্রাপাত্র বিচার হারাইয়া ফেলে, অবশ্য কাহারও কাহারও এই প্রবৃত্তি গঙ্গাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। তাই

অনেকের বাক্সে কয়লা হইতে সুরু করিয়া হীরকখণ্ড পর্য্যন্ত সংগৃহীত দেখা যায়। সেইরূপ, অনেক শিশু রাস্তার পাথর, এমন কি ঢিল হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রকার বন্যফল প্রভৃতি কুড়াইয়া আনে ও তাহাদের নিজস্ব বাক্সে বা থলিতে সেগুলি ভর্ত্তি করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অনেক অভিভাবকই শিশুদের এই সারাদিনের সঞ্চিত মূল্যবান্ বস্তুগুলিকে আবর্জ্জনা বলিয়া মনে করেন ও তাহাদিগের পরম আদরের এই বস্তুগুলি বিসর্জ্জন দিয়া, তাহাদের মন হইতে এই মূল্যবান্ প্রবৃত্তিটিকেও বিসর্জ্জন দিতে বসেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, শিশু যাহা পাইতে ইচ্ছা করে, তাহার প্রতি আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া যাই, ফলে তাহাদের সেই সমস্ত অপূর্ণ বাসনা নানারূপে অবাঞ্ছনীয় অভ্যাসে পরিণত হয়।

সঙ্গলিপ্সা শিশুর আর একটি সহজাত বৃত্তি। কারণ সমাজপ্রীতি মানুষের মজ্জাগত। তাই শ্রেণীতে ছাত্রগণকে অন্যান্য ছাত্রের সহিত কথা বলিয়া এবং তাহাদের সহিত মিশিয়া বিশেষ আনন্দ পাইতে দেখা যায়। তাহাদের এই প্রবৃত্তি অপ্রাকৃত নহে, বরঞ্চ বিশেষ প্রকৃতিগত। কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে সময় ও ক্ষেত্রের সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করাই শিক্ষকের কার্য্য—তাহাকে নির্ব্বাসিত করা নহে।

ক্রোধ ও শৃঙ্খলামোচনের দুর্ব্বার প্রয়াস যেমন কিশোর ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রবল, অপরদিকে তেমনি বীরপূজা এবং প্রবল ব্যক্তিত্বের নিকট আত্মসমর্পণও শিশুমনের অন্যতম

ধর্ম্ম। তাহারা অনেক সময় সহজেই সন্ত্রস্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করে এবং এই সুযোগ লইয়া শিক্ষকগণও ব্যক্তিত্ব হারাইয়া নানাপ্রকার বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে আয়ত্তে আনিবার প্রয়াস পান। কিন্তু শিক্ষক ও অভিভাবকগণের এই প্রবৃত্তি শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইলেও ইহার প্রয়োজন ছিল—কারণ শৈশবই শিক্ষার্থীর স্বর্ণযুগ, তাহাদের চিত্তবৃত্তি ও সহজাত প্রবৃত্তির সহিত পূর্ণ পরিচয় শিক্ষাসরণিকে প্রশস্ত করিতে পারে এবং শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন ও চিত্তনিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারে।

বর্ত্তমান ভারতের বিদ্যালয়সমূহ ছাত্রগণের নিকট কারাগারের রূপ ধারণ করিয়াছে—শিক্ষকগণ যেন ইহার প্রহরী বা কারারক্ষী। ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক ও প্রীতির সম্বন্ধ, তাহা আজ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; তাহাদের মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতার মনোভাব দেখা গিয়াছে। কিন্তু এজন্য দায়ী কে? ছাত্রগণ যে আজ বিপথগামী হইয়া প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, জন্ম হইতেই কেহ দুষ্ট মন লইয়া আসে না। তাই "শিব গড়িতে গিয়া যদি বানর" তৈয়ারী হয়, তাহার জন্য নিশ্চয়ই কিশোর ছাত্রগণকে সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। আর একটি কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার্থিচিত্তের বুভুক্ষা,

কৌতূহল, অভাব ও অভিযোগ মিটাইবার—তাহাদের অভাব ও অভিযোগ দূর করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাহাদের সৃজনাকুল সক্রিয় মনের যথাযথ খোরাক না দিতে পারায়, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাক্ষেত্রে এত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। উপরন্তু প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবেই হউক, আর আদর্শের অভাবেই হউক, এই চঞ্চল কিশোরগণকে সুপথে পরিচালিত করিতে হইলে যে ব্যক্তিত্ব, সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতা, হৃদয়ের সম্পদ্ এবং স্বাচ্ছন্দ্য থাকার প্রয়োজন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে—Idle brain is the devil's workshop. আমাদের বিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থীকেই সৃজনাত্মক কার্য্যে নিয়োজিত করা হয় না—করিবার চেষ্টাও করা হয় না। অবশ্য ইহার মূলে আছে, শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্য ও দেশের শিক্ষকদের দুরবস্থা। পরিশেষে এই কথা বলা চলে যে, যতদিন না শিক্ষার্থিগণের এই সৃজনের স্পৃহাকে শিক্ষাক্ষেত্রে রূপায়িত করিবার সুযোগ দেওয়া না হয়, ততদিন প্রকৃত শিক্ষার বীজ উপ্ত হইবে না।

(খ) শিক্ষার্থী ও বংশানুক্রম (Child & Heredity)

বংশানুক্রমের প্রভাব

শিক্ষার্থিচিত্তের সহিত শিক্ষকের নিবিড় পরিচয়ের যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ শিক্ষার্থিজীবনকে বিকাশের পথে সহায়তা

করিতে হইলে, তাহার সংস্কার, সহজাত বৃত্তি ও পরিবেশ নির্দ্ধারণ করাও শিক্ষকের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য।

শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাহার জীবনায়ন অনেক পরিমাণে আপনার আয়ত্তে আনিবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতেছে সত্য, কিন্তু সে তাহার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে, বংশগত বা জাতিগত সংস্কারধর্ম্মকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই। তাই দেখা যায় যে কেবল পরিবেশ বা আবেষ্টনীই মানবশিশুকে অভীষ্টরূপে গঠিত করিতে পারে না, গঠনের পথে সহায়তা করে মাত্র; শিক্ষক যদি এই সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকিয়া তাহার বংশগত ও জন্মগত গুণসম্পদের পূর্ণস্ফূর্ত্তির জন্য অনুকূল আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিতে পারেন তবেই তাঁহার কার্য্য সহজ ও সার্থক হইতে পারে। নতুবা কেবল তর্জ্জন-গর্জনে সকল প্রকার শাসনের বেড়াজালের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থী ক্রমশঃই আড়ষ্ট হইয়া পড়ে—ক্রমেই তাহার স্বাধীনসত্তার বিলুপ্তি ঘটিতে থাকে। এইজন্য শিক্ষকের গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া অনেকে শিক্ষকের সহিত ক্ষেত্ররক্ষী (মালী)র সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার মতে উদ্যানপালক যেমন অঙ্কুরের রূপ, তাহার জাতি ও পূর্ব্বের ইতিহাস জানিয়া তাহার উপযোগী ক্ষেত্রে তাহাকে আরোপিত করেন—অনুকূল পরিবেশের পটভূমিকায় যথাযথ তাপ ও জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা দ্বারা তাহাকে পরিপুষ্ট করিতে প্রয়াস পান, সেইরূপ শিক্ষকগণকেও এই শিশুদের কখনও বা স্নেহরস সিঞ্চনে

কখনও বা তর্জ্জনের উত্তাপে প্রকৃত পরিবেশ সংস্থাপিত করিয়া ক্ষেত্রপালের কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে শিক্ষাক্ষেত্রে সুফলের আশা আছে। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে শিক্ষকের কার্য্য ক্ষেত্রপালের কার্য্য হইতে দুরূহ—কারণ অঙ্কুরের মনোবৃত্তি বলিয়া কিছুই নাই—কিন্তু শিশুর স্বতন্ত্র চিত্তবৃত্তি বিদ্যমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক শিশুর পরিণতির মূলে আছে দ্বৈত প্রভাব (১) বংশানুক্রম, (২) আবেষ্টনী।

এখন কাহাকে বংশানুক্রম বা বংশানুবর্ত্তন বলে এবং মানব-জীবনে ইহার প্রভাব কতদূর তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন :—

বংশানুবর্ত্তন বা বংশানুক্রম (Heredity)

বাংলাদেশে একটি চলতি কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় —যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা। ইহা কেবল বাংলা ভাষাতেই নহে সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষাতেও অনুরূপ যথেষ্ট প্রবচন পাওয়া যায়, কতকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) আত্মবৎ জায়তে পুত্রঃ (আত্মজঃ)

(২) Like father like son.

ইহা হইতে মনে হয় যে এই প্রবচনগুলির মূলে কিছু সত্য ও তথ্য নিহিত আছে। সত্যই ইহা অভিজ্ঞতাপ্রসূত যে সন্তানগণ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতামাতার বিশেষ বিশেষ দৈহিক ও মানসিক শক্তি বা বৃত্তির অধিকারী হয়।

ওয়াইসম্যান (Weismann) প্রভৃতি মনীষীর মতে পুরুষের সৃজনাত্মক যে বীজ স্ত্রীর সাহচর্য্যে সন্তানের জন্ম দেয় তাহা দেহের পরিপোষণাত্মক অন্যান্য বীজ বা জীবকোষের সহিত মিশিয়া যায় না বা দেহের পরিপুষ্টির পথে সহায়তা করে না। ইহা বরাবরই পৃথকরূপে থাকিয়া সৃজনাত্মক বীজরূপেই বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। ফলে পিতামাতা ধারাবাহিকভাবে এই জৈবীশক্তিকে বংশগত সম্পদরূপে রক্ষা করেন ও যথাক্রমে সঞ্চারিত করেন। তাই অনেকে ইহাকেই পিতাপুত্রের মধ্যে সাদৃশ্যের কারণরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহার যৌক্তিকতা নির্দ্ধারণে তাঁহারা হয়ত অক্ষম। ফলে দেখা যায় যে এই বংশানুবর্ত্তনের মধ্যে যথেষ্ট গরমিল রহিয়া যাইতেছে—ইহা যেন একটি জটিল গ্রন্থিবিশেষ।

বিশেষজ্ঞদের মতে প্রত্যেক সত্তার উদ্ভব একাধিক প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গভীর পর্য্যবেক্ষণের ফলে ইহা নিরূপিত হইয়াছে যে ভাবী সন্তানের কতকগুলি উপাদান নাকি স্ত্রীজীবকোষে (ovum) নিহিত থাকে এবং কতকগুলি পুরুষের জৈবশক্তির প্রভাবে কার্য্য করে এবং ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়া শিশুকে বিশিষ্ট মানসিক ও দৈহিক রূপ দান করে। স্ত্রী ও পুরুষের এই জীবকোষ এবং জৈবশক্তির মধ্যে কিন্তু উপাদানের তারতম্য

রহিয়া যায়, ফলে উভয়ের মিলনের গভীরতা ও রীতির উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

আবার ইহাদের পরিপুষ্টি পারিপার্শ্বিককে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব এই পুষ্টির সহিত এতই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে দুই-এর মধ্যে বিশিষ্ট সীমারেখা নির্দ্ধারণ করা সত্যই কঠিন।

মহামতি মেণ্ডেল (Mendel) আলোচ্য বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার মতে পুরুষের জৈবশক্তি ও স্ত্রীর বীজকোষ বা বীজাধারের সংমিশ্রণে যে 'সত্তা'র উৎপত্তি হয় তাহার কতকগুলি পুরুষের জৈবশক্তির অনুরূপ হয়, আবার কতকগুলি জননীর অনুবর্ত্তী হয়, আবার কতকগুলির মধ্যে উভয়ের ধর্ম্ম একটি বিশেষ অনুপাতে আবর্ত্তিত হইতে থাকে।

পূর্ব্বের আলোচনা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রাসঙ্গিক না হইলেও ইহার সহিত শিক্ষার একটি অলক্ষ্য যোগাযোগ আছে। কারণ বর্ত্তমান শিক্ষা প্রত্যেক সন্তানের মধ্যে যাহা প্রচ্ছন্ন থাকে বা থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাকে উদ্ঘাটিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু বাস্তবরাজ্যে শিশুর মানসিক ও দৈহিক ক্রমপরিণতির পথে বংশানুবর্ত্তন এবং সৃষ্টিতত্ত্ব যেন রহস্যময় কুহেলী রচনা করিয়া আজও দম্ভভরে সভ্যতাকে বিদ্রূপ করিতেছে।

এখন দেখা যাউক যে এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষকের ও অভিভাবকের কর্ত্তব্য কি ? প্রথমতঃ—বংশানুবর্ত্তনের সম্যক আলোচনা

দ্বারা শিশুর সুপ্ত ও সম্ভাবিত শক্তিকে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা।

দ্বিতীয়তঃ—এই জন্মগত গুণসম্পদ ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণের পর তাহাকে উপযুক্ত পরিবেশে সংস্থাপিত করা।

বংশগত বা জন্মগত গুণসম্পদ ও বৃত্তির অধিকার ও কার্য্য মানুষ পূর্ণ আয়ত্তে আনিতে অক্ষম, তাই অনেকে ইহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকিয়া কেবল পরিবেশ বা আবেষ্টনীর প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কিন্তু দেখা যায় যে, কেবল ভাগ্য বা সুকৃতি ও জন্মান্তরবাদ লইয়া বসিয়া থাকিলেও যেমন সুফলের আশা কম সেইরূপ কেবল পরিবেশসৃজনের উদ্দাম প্রয়াসেও আশানুরূপ ফলের সম্ভাবনা অল্প। শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়েরই প্রভাব বিদ্যমান। তাই উভয়ের প্রভাব শিক্ষার্থিজীবনে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

(গ) শিক্ষার্থী ও পরিবেশ
(Child & Environment)

কিন্তু পরিবেশের উপরেই মানুষের অধিক লক্ষ্য থাকা উচিত। কারণ এই পরিবেশসৃজনের উপর নির্ভর করে জীবনের স্ফূর্ত্তি ও সম্পূর্ণ প্রকাশ, এবং ইহার অভাবেই বহু মনীষা ও সদ্‌বৃত্তি প্রসুপ্ত রহিয়া যায় ; এমন কি বিকৃতিও ঘটিতে পারে।

আলোচনা করিলে দেখা যায় যে শিক্ষার্থী অধিকাংশ সময়ই গৃহে ও বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করে। তাহার পর ক্রমশঃ সে বৃহত্তর জীবন ও বাহিরের সমাজের সংস্পর্শে আসে। তাই এই সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিতে হইলে নিম্নলিখিতভাবে বিষয়টিকে বিন্যস্ত করিয়া লওয়া সুবিধাজনক।

(১) শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়।

(২) শিক্ষার্থী ও গৃহ।

(৩) শিক্ষার্থী ও সমাজ।

শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ঃ—

বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে শিক্ষার্থীকে নিরন্তর শিক্ষকের সংস্পর্শে আসিতে হয়। কারণ বিদ্যালয় বলিতে কেবল ঘরবাড়ী, খেলার মাঠ বা পাঠাগার বুঝায় না। শিক্ষকই বিদ্যালয়ের কেন্দ্র। তাই প্রাসাদোপম বিদ্যালয়গৃহ থাকিলেই বিদ্যালয়ের গৌরববৃদ্ধি হয় না। শিক্ষকের উপরেই বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও বিদ্যালয়ের কার্য্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। শিক্ষকই শিক্ষার্থি-জীবনের ধ্রুবতারা এবং আশা ও উদ্দীপনার উৎস। তাঁহারই চরিত্র, ব্যক্তিত্বের উপর বিদ্যালয়ের সাফল্য ও পরিবেশ বিশেষ নির্ভরশীল। বিদ্যামন্দিরে বাগ্‌দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকার্য্যে শিক্ষকই ঋত্বিক। তিনিই প্রজ্ঞার মূর্তিমান প্রতীক, তাই পরিবেশের মধ্যে শিক্ষকের স্থান সর্ব্বোচ্চে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শিক্ষার্থীর সহিত শিক্ষকের সম্পর্ক ঃ—

এইজন্যই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি অনাবিল আন্তরিকতা ও নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া ওঠা একান্ত প্রয়োজন। তাহাদের মধ্যে এই সম্পর্ক মধুর ও সুখময় না হইলে উভয়ের পক্ষেই তাহা গ্লানিকর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ ভারতের সেই অতীত আদর্শ যেন ক্রমশঃই ম্লান হইয়া আসিতেছে। শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিবর্ত্তে ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা যেন ছাত্রদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে একটি হিংসা ও প্রতিযোগিতার ভাবও বিদ্যমান।

কিন্তু ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহার জন্য শিক্ষকও যেরূপ দায়ী—অন্যান্য পরিবেশও অনুরূপভাবে দায়ী। মোট কথা, শিক্ষার্থীর অপেক্ষা শিক্ষার্থীর পরিবেশ এই অবাঞ্ছিত পরিণতির জন্য দায়ী।

কেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই মধুময় সম্পর্কের বিলোপ ঘটিতেছে ইহার কারণ নির্দ্ধারণ দুষ্কর না হইলেও ইহার সমাধান সহজসাধ্য নহে।

প্রথমতঃ—শিক্ষকের অভিজ্ঞতা ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের অভাব।

দ্বিতীয়তঃ—শিক্ষকের প্রাণশক্তির অভাব বা উগ্রপ্রাণশক্তির বিকৃত রূপ।

তৃতীয়তঃ—আকর্ষণী শক্তি ও স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সঞ্চার বিষয়ে শিক্ষকের ঔদাসীন্য।

চতুর্থতঃ—ছাত্রগণের জীবনের সুখদুঃখের প্রতি উপেক্ষা—প্রীতি, দরদ ও স্নেহের অভাব।

শিক্ষকের দিক হইতে এই ত্রুটিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত সম্পর্কের সূচনা করে। অবশ্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অন্যান্য পরিবেশও এই বিকৃতির জন্য দায়ী। যথা—

শিক্ষার্থী ও গৃহ

জন্ম হইতে সুরু করিয়া গৃহপরিবেশেই শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তির বিশেষ বিকাশ হয়। তাই আধুনিক শিক্ষাধারায় বিদ্যালয় হইতে গৃহের প্রভাবই অধিক বলিয়া মনে হয়। বিদ্যালয়-জীবনে যেটুকু আদর্শ ও সদ্বৃত্তি আহৃত হয় গৃহে বা বাহিরে তাহা ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া যায়। ফলে কেবল বিদ্যালয়ের চেষ্টায় স্থায়ী সুফল ফলিতে পারে না। ইহার জন্য গৃহেও অনুকূল পরিবেশ রচনা করা অভিভাবকগণের ঐকান্তিক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ অভিভাবকই বিদ্যালয়ে শিশুকে পাঠাইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকেন এবং তাঁহাদের এই গুরু দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে চান। বৎসরের শেষে পরীক্ষার পরে Progress Reportকেই তাহার অর্জ্জিত বিদ্যাবত্তার ও সাফল্যের মাপকাঠি বলিয়া মনে করেন। পরীক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহাদের সন্তানের বিফলতা হয়ত তাঁহাদিগকে ক্ষণিকের জন্য উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। বড় জোর দুই একদিন উত্তমমধ্যম দিবার পর তাঁহারা একজন উপশিক্ষকের (Private

Tutor) ব্যবস্থা করেন। এদিকে জননীও বালকের উপদ্রব হইতে মুক্ত হইবার আশায় বালককে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকেন এবং বিদ্যালয়ের অবকাশে মনে মনে হয়ত শিক্ষককুলের প্রতি অভিসম্পাত দান করেন।

শিশুর রুচি ও চিত্তবৃত্তির প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া তাঁহারা সর্ব্বদাই আপনাদের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সজাগ। সত্যই যে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-দীক্ষা উপযুক্ত পরিবেশ না পাইলে সার্থক হইতে পারে না, এ বিষয়ে তাঁহারা মোটেই সচেতন থাকেন না।

অবস্থানুযায়ী তাঁহাদের নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। যথা—

শিশুর জন্য পাঠগৃহ বা পূত, স্নিগ্ধ, নির্জ্জন অধ্যয়ন-স্থান।

তাহাদের উপযুক্ত খেলাধূলার ব্যবস্থা ও সাজসরঞ্জাম।

জননীর শিক্ষা, স্নেহতর্জন—গল্প-ছড়া ও নানাবিধ পৌরাণিক কাহিনীর পরিবেশন।

মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে লইয়া দেশভ্রমণ—তাহার জন্য বয়স অনুযায়ী নানাপ্রকার গ্রন্থ সরবরাহ।

কুসঙ্গ হইতে মুক্ত রাখিবার ঐকান্তিক চেষ্টা ও সম্ভবস্থলে সৎসঙ্গ লাভের ব্যবস্থা ও গৃহেই সর্ব্বপ্রকার আয়োজন।

ইহা ছাড়াও অভিভাবকের সান্নিধ্য ও সহানুভূতিশীল আচরণ, উৎসাহদান এবং বৃহত্তর জীবনের আদর্শ সঞ্চার শিশুর ক্রমপরিণতির পথে একান্ত অপরিহার্য্য। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয় যে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই। অনেক গৃহে অভিভাবকগণ ছাত্রগণের সম্মুখে এমন মন্তব্য ও আলোচনা করেন যাহা ছাত্রগণের ভাবী জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করে। এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই সচেতন থাকিতে হইবে। আরও দেখা যায় যে অনেক অভিভাবক শিক্ষকদের সম্পর্কে নানারূপ অশ্রদ্ধার ভাব ও অবজ্ঞা দেখাইয়া শিক্ষার্থিহৃদয়ের শ্রদ্ধাকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করেন। তাই আজ শিক্ষার্থিগণ যে শ্রদ্ধাহীন ও উদ্ধত হইয়া পড়িতেছে তাহার জন্য অভিভাবকগণও বিশেষ দায়ী। কেবল শিক্ষকগণের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে সজাগ থাকিলেই চলিবে না—তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিয়া শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রশস্ত করিতে না পারিলে অভিভাবকগণেরই ভাবী জীবন বিষময় হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা।

শিক্ষার্থী ও সমাজ

সমাজ বলিতে এমনি একটি বৃহত্তর জীবনকে বুঝায় যাহার সহিত প্রতিটি মানবের সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক ও হয়ত বাঞ্ছনীয়। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ সমাজপরিবেশের সহিত পরিচয়কে নিবিড় করিয়া তুলিতে হইবে।

দুঃখের বিষয়, আজ আমরা যে শিক্ষাব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি তাহার মধ্যে বৃহত্তর জীবনের সংস্পর্শে আসিবার কোন সুযোগই শিক্ষার্থীদের মেলে না। কারণ তাহাদিগকে

হয় গৃহকোণে, না হয় আবাসে গণ্ডীবদ্ধ রাখিবার জন্য অভিভাবকগণ আকুল হন। কিন্তু ইহা কতদূর যৌক্তিকতাপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

প্রথমতঃ মানুষের সঙ্গলিপ্সা ও সমাজচেতনা মজ্জাগত, এবং শিশুবয়স হইতেই তাহার উন্মেষ ঘটিতে থাকে। কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে রুদ্ধ করিবার প্রয়াস না করিয়া মাঝে মাঝে বৃহত্তর জীবনের মধ্যে ইহাদিগকে আনিয়া শিক্ষকের পরিচালনায় রাখিতে পারিলে অমঙ্গলের আশঙ্কা অপেক্ষা মঙ্গলেরই আশা করা যায়, কারণ ক্রমশঃ ইহাদিগের বাস্তবের সহিত পরিচিত করাইয়া না দিলে ভাবী জীবনে বাস্তবের সহিত সংগ্রামে পরাজয়ের সম্ভাবনাই অধিক।

তাই বাস্তবের রূপ আংশিক ভাবে কলুষিত ও অসুন্দর হইলেও তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া সমস্যার সমাধানের আশা করা যায় না। বরঞ্চ বর্ত্তমান ভারতীয় পরিস্থিতিতে আবাসিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিয়া অনুকূল পরিবেশ সৃজন করিতে হইবে ও সমাজের রূপকে একে একে মনস্তাত্ত্বিক প্রজ্ঞার সহিত শিক্ষার্থিগণের সমক্ষে প্রতিফলিত করিয়া তাহার উদার ও কল্যাণময় রূপকে গ্রহণ করিবার, ও যাহা অসুন্দর ও অমঙ্গল তাহার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

অনেকের মতে শিক্ষার্থীর জীবন, বিশেষ করিয়া তাহাদের বিদ্যালয়-জীবন, সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পরিবেশের মধ্যে

নির্ব্বাহিত হওয়া উচিত। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ বৃহত্তর সমাজের চেতনা ক্রমশঃ শিশুমনে দেখা না দিলে তাহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

এইজন্য সতর্কভাবে বৃহত্তর সমাজের সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে অগ্রণী হইতে হইবে।

(ঘ) বংশানুবর্ত্তন ও পরিবেশ
(Heredity & Environment)

বংশানুবর্ত্তনের ফলে মানবশিশু কতকগুলি হৃদয়ের বৃত্তি ও দৈহিক সম্পদ লাভ করে সত্য, কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তনের পথে বংশানুবর্ত্তনের প্রভাব কতদূর তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

অবশ্য যাঁহারা বংশানুবর্ত্তনকে মনে-প্রাণে স্বীকার করেন তাঁহাদিগের নিকট বাহিরের জগৎ বা পরিবেশের বিশেষ মূল্য নাই।

মানুষ ক্রমশঃই এই জন্মার্জ্জিত বৃত্তি ও শক্তিসম্পদ লইয়া জীবনের পথে যাত্রা করে এবং এই শক্তিনিচয় নাকি আপনা হইতেই পারিপার্শ্বিকের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে প্রয়াস পায়।

এইরূপে যতই বংশানুবর্ত্তন ঘটিতে থাকে ততই পরবর্ত্তী বংশ পূর্ব্বেকার শক্তিসম্পদের সুবিধা লাভে ধন্য হয়।

ল্যামার্ক (Lamarck) প্রভৃতি মনীষীর অনুরূপ সিদ্ধান্তের মূলে দুইটি অনুমান লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, বংশানুবর্ত্তনের ফলে অর্জ্জিত সম্পদ ও বৃত্তিনিচয় ক্রমশঃই বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, জন্মার্জ্জিত শক্তি সম্পদ পরিবেশ অনুযায়ী স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত হয়। এ স্থলে পরিবেশ গৌণ—জন্মার্জ্জিত শক্তি ও বংশানুবর্ত্তনই মুখ্য। আবার অন্য একদল মনীষী সভ্যতার অগ্রগতির মূলে পরিবেশের অবদানকে বিশেষভাবে স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে মানুষ হইতে শুরু করিয়া সমস্ত প্রাণীকেই পরিবেশ ক্রমপরিণতি অর্পণ করিতেছে। ইহারই কল্যাণে বর্ত্তমান মানবসমাজ সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ডারউইনের* মতবাদ বিশেষ চিন্তনীয়। কিন্তু এই মতবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিবার পূর্ব্বে একটি বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়।

যদি পরিবেশই সমস্ত প্রাণশক্তিকে সমভাবে উজ্জীবিত ও উন্নীত করে তবে মানুষে মানুষে এত ব্যবধান কেন? ইহার

---

* ডারউইনের মতে জগতের এই বিবর্ত্তনের মূলে দুইটী নীতি বিদ্যমান। প্রথমতঃ Principle of natural selection—অর্থাৎ জীবনধারণোপযোগী শক্তি ও যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাণিকুলের সংখ্যা বা সত্তা প্রকৃতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। দ্বিতীয়তঃ Principle of variation —অর্থাৎ বংশানুবর্ত্তনবশে বংশপরম্পরাক্রমে আপতিত সাদৃশ্য আপাতদৃষ্ট হইলেও বৈচিত্র্যও সাধারণতঃ কিয়ৎ পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, এবং এই বৈচিত্র্যগুলিই নাকি প্রাণিবিশেষকে জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত করিয়া তোলে।

সদুত্তর না মিলিলেও এই কথা বলা চলে যে জগতের সৃষ্টি-রহস্য এতই জটিল যে কোথায় সামান্য বৈচিত্র্য সংঘটিত হওয়ার জন্যই হয়ত এই বিপুল ব্যবধান দেখা দেয়। তবে আমরা যাহাকে সংস্কার ও জন্মগত সম্পদ বলি তাহা সঞ্চারিত হয় কি না এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের অভাব নাই। দেখা যায় যে অবয়বগঠনে ও মানসিকবৃত্তি অর্জ্জনে অর্থাৎ আকৃতি ও প্রকৃতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতা পুত্রের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু একই জন্মের অধিকৃত বৃত্তি, বিকৃতি বা বৈচিত্র্য যে সঞ্চারিত হয় না এ বিষয়ে প্রায় স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে—

একজন কর্ম্মকার আজীবন মাংসপেশীর চালনার ফলে যে পরিপুষ্টি ও গঠনসৌষ্ঠব লাভ করিল তাহার পুত্রের মধ্যে মাংসপেশীর সেই সৌষ্ঠব দেখা দিবে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে হয়ত মনে জাগিতে পারে যে তবে কেন অমায়িক পিতামাতার পুত্র সাধারণতঃ অমায়িক হয়, বলিষ্ঠ পিতামাতার সন্তান হৃষ্টপুষ্ট হয়? ইহার আলোচনা বংশানুবর্ত্তনের মধ্যেই করিয়াছি। তবে এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে যে প্রকৃতিগত বা বৃত্তিগত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূলে যে সর্ব্বদাই বংশানুবর্ত্তন কার্য্য করে তাহা নহে—ইহা পরিবেশ ও বংশধারার সংমিশ্রণের ফল, অর্থাৎ এক একটি পরিবেশ বা বংশে এক একরূপ নীতিরীতি ও আবহাওয়া বিরাজ করে। জন্ম হইতে নিত্যনিয়ত সেই পরিবেশ ও সমাজের সহিত পরিচয়ে মানব

তাহার দ্বারা অনিবার্য্যরূপে প্রভাবিত হয়। ইহাকে অনেকে ইংরাজীতে social heredity বলেন।

বর্ত্তমান যুগে মানুষের ভবিষ্যৎ মানুষ আপনার হাতে তুলাইতে চাহে। মানুষে মানুষে যে পার্থক্য তাহার মূলে বংশানুবর্ত্তনের বিশেষ কোন প্রভাব আছে বলিয়াও তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে পরিবেশ ও শিক্ষাই মানুষের ভবিষ্যৎকে রূপ দেয়।

লক (Lock) প্রভৃতি মনীষী বলেন যে মানুষের মনে যেরূপ যেরূপ চেতনার সঞ্চার করা হয়, তাহার অন্তরে অনুরূপ মানসিক বিকাশ লক্ষিত হয়। যদি একই চেতনা দুই জনের মনে গোড়া হইতে সঞ্চারিত করা যাইত তবে হয়ত তাহাদের মধ্যে কোন বৃত্তিগত পার্থক্যই থাকিত না। কিন্তু ইহা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। অপরদিকে গল্টন (Galton) প্রমুখ মনীষী মানুষের জন্মগত বৃত্তির উপর বিশেষ জোর দেন। তাঁহাদের মতে জীবনের একটি স্বতন্ত্র গতি আছে এবং স্রোতের আবর্ত্তে মানুষের সেই বংশানুক্রমসূত্রে অর্জ্জিত বৃত্তি ক্রমশই দানা বাঁধিতে থাকে। পরিবেশ ও মানুষের জীবনের সম্পর্ককে একদিকে স্রোত ও বায়ুবেগ এবং অপরদিকে তরণীর মধ্যে সম্পর্কের সহিত তুলনা করা চলে। দেখা যায় যে গল্টন-সম্প্রদায় বংশানুক্রমের উপর বিশেষ জোর দেন এবং অন্য সম্প্রদায় শিক্ষা ও শিক্ষা-পদ্ধতির উপর বিশেষ আস্থাশীল। ইহারা হার্বার্ট (Herbart) সম্প্রদায় নামে পরিচিত। উভয় মতবাদের পিছনেই কিছু সত্য

নিহিত আছে। তবে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে কেবল বংশানুবর্ত্তনই মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না—ইহার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সম্যক পরিবেশের প্রয়োজন। সেইরূপ একমাত্র পরিবেশই মানবকে যথারুচি গড়িয়া তুলিতে পারে না, ইহার জন্য জন্মগত বৃত্তির প্রয়োজন।

আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশে আজ পরিবেশ সৃজনের বিশেষ প্রয়াস দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের মতে পরিবেশই আমাদের জীবনযাত্রার পথে বিশেষ পরিপোষক ও প্রভাবক।

অন্য যে যে উপাদান ও প্রভাব উন্নতি ও ঋদ্ধির পরিপোষক-রূপে পরিলক্ষিত হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার না করিলেও যাহা আমাদের মধ্যে নিহিত আছে তাহাকেই যথাসম্ভব পরিকল্পিত করাই সমাচীন। কারণ যাহা আয়ত্তাতীত তাহা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

তাই কি ভাবে শিক্ষার্থীকে যথাযথ পরিবেশে স্থাপিত করিয়া তাহার অন্তর্বৃত্তিকে উন্মেষিত ও পরিপুষ্ট করা যায় তাহাই আলোচ্য।

প্রথমতঃ তাহার জন্মগত বৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তি, আবেগ, স্বাভাবিক রসানুভূতি (temperament) ও বংশগত সংস্কার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তাহার পর একে একে তাহাকে বয়োধর্ম্ম অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবেশে স্থাপিত করিতে হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠ্যগ্রন্থ

(CURRICULUM)

সংকেতঃ—শিক্ষার্থী ও পাঠ্যগ্রন্থ—পাঠ্যগ্রন্থের প্রয়োজন ও প্রভাব—পাঠ্যবিষয়ের উপাদান—পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়নের নীতি ও রীতি—বর্ত্তমান পাঠ্যতালিকার ত্রুটী ও তাহার সংস্কার।

(ক) শিক্ষার্থী ও পাঠ্যগ্রন্থ
(Curriculum)

জীবনের সহিত শিক্ষার সম্পর্ক যে নিবিড় এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। তাই শিক্ষাকে জীবনের প্রতি সজাগ থাকিতে হইবে। শিক্ষার্থীর জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার পথে শিক্ষকের যেরূপ দায়িত্ব আছে—পাঠ্যগ্রন্থেরও অনুরূপ দায়িত্ব আছে। বরঞ্চ পাঠ্যগ্রন্থকে শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিলে ভুল হইবে না।

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে অভিব্যক্ত করা, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের উন্মেষ সাধন করাই যেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্য, অতএব এমন কতকগুলি বিষয় নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত যেগুলির সহিত

জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই অনুরূপ বিষয়কে যতদূর সম্ভব ব্যাপক ও উপভোগ্যরূপে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

(খ) পাঠ্যগ্রন্থের প্রয়োজন ও প্রভাব

শিক্ষাদান বিষয়ে পাঠ্যগ্রন্থের প্রয়োজন আছে কিনা এবিষয়ে আজ চিন্তা করিবার অবসর ঘটিয়াছে সত্য ; কিন্তু ইহাও সত্য যে পাঠ্যগ্রন্থের প্রয়োজন অস্বীকার করিলে শিক্ষকের প্রয়োজনকে অতিমাত্রায় স্বীকার করিতে হয় এবং শিক্ষকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাধারা শিক্ষকের প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার না করিলেও তাহাদিগকে নেপথ্যে স্থান দিয়াছে।

কোন বিষয়ে ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিবে ও প্রয়োজনস্থলে শিক্ষক কেবল তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান শিক্ষার পরিকল্পনা। সমস্ত শ্রেণী জুড়িয়া ছাত্রগণের মধ্যে একটি কৌতূহল ও শিক্ষালাভের আয়োজন চলিতে থাকিবে এবং শিক্ষক কেবল সেক্ষেত্রে প্রয়োজকের কার্য্য করিবেন।

এক্ষেত্রে গ্রন্থের উপরই অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে একথা বলাই বাহুল্য। তাই দেখা যায় গ্রন্থের অনেক কিছুই দায়িত্ব রহিয়াছে। এখন গ্রন্থের উপাদান সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন।

(গ) পাঠ্য বিষয়ের উপাদান

পাঠ্যগ্রন্থের উপাদান বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে— কি কি বিষয়বস্তুর বিন্যাসে সাধারণতঃ পাঠ্যগ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত? পাঠ্যবিষয়কে কেবল বিষয়বস্তুর সমষ্টি বলিলে ভুল হইবে। ইহার একটি সামগ্রিক দিক আছে।

তাই ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবণতা ও কৌতূহলকে বিশেষরূপে স্থান দেওয়া উচিত, না তথ্য ও সমাজচেতনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থগুলি প্রণীত হওয়া উচিত—এ বিষয়ে বিশেষ আলোকপাতের প্রয়োজন।

একদিকে সাহিত্য, ইতিহাস, পৌরনীতি প্রভৃতি কল্পনা ও কৃষ্টি-কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু এবং অপরদিকে বিজ্ঞান, গণিত, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি তথ্যমূলক ও কারিগরী শিক্ষার প্রবর্ত্তন - কোন্ দিকটির পাঠ্য-বিষয়ের মধ্যে অধিক মূল্য দেওয়া উচিত ইহাই বিবেচ্য।

ইহাদিগের প্রয়োজন ও জীবনের উপর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা নিম্নে নিবদ্ধ হইল।

কৃষ্টিকেন্দ্রিক বিষয় (Theoretical)

সাহিত্য ও ইতিহাস

সাহিত্য জীবনের একটি বিশেষ পরিচয় ও কাল্পনিক রূপ, মানবচিত্তের উপর ইহার প্রভাব অপরিসীম (cf. Literature is Criticism of Life)। তাই গ্রন্থের মধ্যে গল্প, কবিতা, জীবনী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়কে স্থান দেওয়ার সার্থকতা আছে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে এই সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থগুলি এইরূপভাবে প্রণীত হওয়া উচিত যে ইহাদের সহিত জীবনের ও শিশুমনের ক্রমপরিণতির বিশেষ যোগাযোগ থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কেবল নীরস বিষয়বস্তুর বিন্যাসে গ্রন্থগুলিকে এরূপভাবে ভারাক্রান্ত করা হয় যে শিশুর মনের উপর তাহাদের কোনরূপ আকর্ষণ থাকে না। তাই যুগসাহিত্য ও সাময়িক পরিবেষ্টনীকে সাহিত্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করার প্রয়োজন।

কল্পনাশক্তির বিকাশ ও কমনীয় বৃত্তির উন্মেষ সাধনই যে সাহিত্যগ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য একথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিস্মৃত হয়।

প্রণয়ন বিধি—

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে সাহিত্য পুস্তকগুলিকে—কি বিষয়বস্তু বিন্যাসে, কি ছবি ও ছড়ার প্রাচুর্য্যে, কি নাটকীয় বস্তুর সমাবেশে, কি গঠনসৌষ্ঠবে, সর্ব্বতোভাবে বিশেষ লোভনীয় করিয়া তুলিতে না পারিলে পাঠ্যপুস্তকের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে।

ইতিহাসকে বর্ত্তমান দৃষ্টিতে কেবল ঘটনার বিন্যাস বলা যায় না। ইতিহাসের নিজস্ব একটী গতি আছে। সভ্যতার বিবর্ত্তনে মানবচরিত্রের ক্রমবিকাশ, সভ্যতার উত্থান পতন, নব নব ধর্ম্মের অভ্যুদয় প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় ঘটনার জ্বলন্ত সাক্ষ্য

দেয় এই ইতিহাস। তাই জাতীয়তাবোধের ও বিশ্লেষণী শক্তির উন্মেষ সাধন করা ইতিহাসের দায়িত্ব। এই দিক হইতে ইতিহাস মানুষের ফেলে-আসা জীবনের একটি প্রাণবন্ত ছবি। তাই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সাম্প্রতিক ঘটনার বিন্যাস বাঞ্ছনীয়—যাহাতে কিশোর ও শিশুচিত্ত এই ইতিহাসের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হইয়া জগতের মানবচরিত্র সম্পর্কে কৌতূহলী হইতে পারে।

অনুশীলনীয় বিষয় ও বিজ্ঞান

(ব্যাকরণ, গণিত, বিজ্ঞান)

একদিকে যেমন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি কৃষ্টিকেন্দ্রিক বিষয় শিক্ষার্থিচিত্তের ভাব ও কল্পনা, ধ্যান ও ধারণাকে উন্মেষিত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক অন্যদিকে তেমনই মনকে নিয়ামক ও পর্য্যবেক্ষণশীল করিবার জন্য বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি শিশু-মনের সমস্যা সমাধানের শক্তি বাড়াইয়া দিয়া ইহাদিগকে বস্তুজগতের উপযোগী করিয়া তোলে।

অনুশীলনীর উপর এইসব বিষয়ের শিক্ষা বিশেষ নির্ভর করে। তাই অনুশীলনী শক্তির বিকাশের জন্য, স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যকে বৃদ্ধি করিবার জন্য এই বিষয়গুলির বিশেষ সার্থকতা।

এই উদ্দেশ্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইভাবে গ্রন্থগুলি লিখিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য

যে বিজ্ঞান ও গণিতের বিষয়বস্তুবিন্যাসে লেখকের বিশেষ অভিজ্ঞতা, মনস্তাত্ত্বিকতা ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন।

বিজ্ঞান ঃ—

বিজ্ঞানের সহিত বস্তুজগতের নিবিড় যোগাযোগ। তাই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের জন্য পারিপার্শ্বিকের প্রতি সজাগ থাকিয়া বিজ্ঞান প্রণয়ন করা সঙ্গত। শিশুর অভিজ্ঞতা হইতে ঘটনা আহরণ করিয়া যাহাতে সে হাতেকলমে সেগুলি শিখিতে পারে এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়া বিজ্ঞান রচনা করাই সমীচীন।

কিন্তু কেবল তথ্য উপস্থাপিত করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে। বস্তু-জগৎ ও প্রকৃতি-জগতের প্রতি শিক্ষার্থীকে কৌতূহলী করিয়া তুলিবার ও তাহার আবিষ্কার-ক্ষমতাকে অঙ্কুরিত করিবার দায়িত্ব যে বিজ্ঞানের, একথা বিস্মরণীয় নহে।

ব্যাকরণ ও গণিত

ব্যাকরণ বিষয়ে ছাত্রগণের ঔদাসীন্য সত্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু কেন? মনে হয় ব্যাকরণটিকে তাহারা নিতান্তই নীরস বলিয়া মনে করে, ইহা তাহাদিগের নিকট যেন বিভীষিকার সঞ্চার করে।

তাই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাকরণ প্রণীত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। উদাহরণের বৈচিত্র্যে, অবরোহণ পদ্ধতিতে ছড়া ও

ছবির সাহায্যে ব্যাকরণকে সরসভাবে রচনা করিলে বোধ হয় এই বিভীষিকার অবসান ঘটিতে পারে।

গণিতকেও এইরূপ সাবলীলভাবে উপস্থাপিত করা উচিত যাহাতে বিচারশক্তি ও পর্য্যবেক্ষণশক্তির পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটিতে পারে।

ভূগোল

বর্ত্তমানে ভূগোল একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় ইহা কেবল কতগুলি স্থান বা বিষয়ের তালিকা নহে। ইহার সহিত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন, মানবসমাজের বিবর্ত্তনের ইতিহাস জড়িত। তাই অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে ভূগোল প্রণীত হওয়া উচিত এবং তাহা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বোধ্যরূপে উপস্থাপিত হওয়া সঙ্গত। ইহার মাধ্যমে পারিপার্শ্বিকের সহিত শিশুর নিবিড় পরিচয় ঘটাইয়া দিয়া বিষয়বস্তুকে যাহাতে অধিকতর আকর্ষণীয় করা যায়, সে দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। **ইহা ছাড়াও বর্ত্তমান পাঠ্য-তালিকার মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের সমাবেশ সাধন করা একান্ত প্রয়োজন।** যথা—

ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা

কেবল মানসিক উৎকর্ষলাভের প্রতি দৃষ্টি দিলেই চলিবে না। যাহাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী অন্ততঃ কয়েকটি হাতের কাজ নিজের শক্তি ও প্রবণতা অনুযায়ী শিখিতে পারে তাহার আয়োজন

করা উচিত—যেমন কাঠের বা চামড়ার কাজ শেখা এবং অঙ্কন, মৃৎ-শিল্প ইত্যাদি অভ্যাস করা। ইহাদের কয়েকটি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইলে শিক্ষার্থীদের মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে শারীরিক উৎকর্ষও জন্মাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে শরীর-চর্চ্চা আমাদের বিদ্যালয়ে যেরূপভাবে অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে তাহাতে অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না করিলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই অচিরে ব্যর্থ হইবে।

শিল্প ও সঙ্গীত

শিল্প ও সঙ্গীতকেও বয়স ও রুচি অনুযায়ী পাঠ্যতালিকার মধ্যে স্থান দিলে বোধহয় ভাল হয়। তবে ইহাকে অবশ্যপাঠ্য না করিয়া ঐচ্ছিক করাই বাঞ্ছনীয়। জীবনে শিল্প ও সঙ্গীতের যে অশেষ প্রভাব শিক্ষার্থিগণকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া এ বিষয়ে তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার দায়িত্ব শিক্ষককে গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঘ) পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়নের নীতি :—

শিক্ষার উদ্দেশ্যের সহিত যে পাঠ্যতালিকা ও গ্রন্থের বিশেষ যোগাযোগ আছে ইহা সুস্পষ্ট। তাই পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন ব্যাপারেও কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। যথা—

(১) জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি—অর্থাৎ দেহ, বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পাঠ্যতালিকার বিশেষ দায়িত্বকে অস্বীকার করা যায় না এবং যাহাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ নাগরিকরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে সেইরূপ উপাদানে পাঠ্য গ্রন্থ প্রণীত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ইহার জন্য মানবজীবনের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এই পাঠ্য-তালিকাকে সংহত করা সমীচীন।

মোট কথা, দেহ চর্চ্চা, মনের উৎকর্ষ, কল্পনার বিকাশ, ক্রিয়াকুশলতা এবং জীবনের ও আধ্যাত্মিক দিকও পাঠ্য-তালিকার মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসের সঙ্গে গণিত, বিজ্ঞান এবং ভূগোলকেও পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা স্বাভাবিক।

(২) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিবেচ্য যে পাঠ্যতালিকার প্রসারের সহিত বিদ্যালয়ের অবস্থানকালের সামঞ্জস্য না রাখিলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ারই সম্ভাবনা। পাঠ্য বিষয়কে শিক্ষণকালের তুলনায় অতিমাত্রায় ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিলে তাহাতে অনর্থের সূচনা হইতে পারে। সে জন্য শিক্ষার্থীর বয়সের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিষয়গুলির যথাযথ উপস্থাপন ও বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করা একান্ত প্রয়োজন।

(৩) পাঠ্যবিষয় নির্ব্বাচন ব্যাপারে আরও একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। শৈশব হইতেই এক একজনের এক একটি ক্রিয়াকুশলতা দেখা দেয়। কাহারও বা কাষ্ঠশিল্পে, কাহারও

মৃৎশিল্পে বা যন্ত্রনির্ম্মাণে, এক একজনের এক একটি বিষয়ে অনুরাগ বা অধিকার থাকিতে পারে।

তাই পাঠ্যতালিকার মধ্যে ইহাদিগকে একেবারে বর্জ্জন না করিয়া এইসব অনুরাগ ও নৈপুণ্য সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ দিকে পূর্ণদৃষ্টি দিতে গিয়া বিদ্যালয়ের সাধারণ সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নহে।

(৪) শিশুর অনুরাগ ও সুপ্তশক্তির দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন। যাহাতে প্রতিটি বিষয়ই শিশুমনের উপভোগ্য হইতে পারে, যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে শিক্ষার্থী আকৃষ্ট হয়—তাহা পাঠ্য বিষয়ের সর্ব্ব-প্রথম লক্ষ্য। অর্থাৎ বয়োধর্ম্ম অনুযায়ী মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর সমাবেশ সাধন করিলে পাঠ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য সার্থক হইবার সম্ভাবনা।

(ঙ) বর্ত্তমান পাঠ্যতালিকার ত্রুটী

(১) পাঠ্যতালিকা ও বিষয়ের স্তর বিন্যাসের অভাব :— বয়স ও শ্রেণী অনুযায়ী বিষয়বস্তুকে ক্রমশঃ সরল হইতে জটিল ও অধিক তথ্যপূর্ণ করা উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান পাঠ্য-তালিকার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে দেখা যায় যে ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজী

বা বাংলা সাহিত্য ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর সাহিত্য অপেক্ষা কোন কোন অংশে দুরূহ। পাঠ্যতালিকার এইরূপ অসামঞ্জস্য শিশু চিত্তের ক্রমবিকাশের পথে বিশেষ অন্তরায়ের সৃষ্টি করে।

(২) বর্ত্তমান পাঠ্যতালিকার মধ্যে বিজ্ঞান ও ক্রিয়া-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টির অভাব লক্ষ্য করা যায়।

(৩) বাস্তব জীবন ও প্রাত্যহিক ঘটনার নিবিড়তর সংযোগ সাধনে ঔদাসীন্য ইহার অন্যতম ত্রুটী। তাই অনেক সময় দেখা যায় যে ভূগোল পড়িয়া শিক্ষার্থীগণ যে জ্ঞান আহরণ করে তাহাতে তাহার গ্রামের বা দেশের ভৌগোলিক বিবরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাই জন্মে না বা দেশের অবস্থিতি, চলাচলের পথ, বাণিজ্যিক যোগসূত্র সম্পর্কে তাহারা যেন একান্ত অজ্ঞ রহিয়া যায়।

এই জন্য উন্নততর প্রণালীতে সুস্পষ্ট ও বিশেষ প্রকারের মানচিত্রের নির্দ্দেশ ও নানা উপকরণের সমাবেশ ভূগোল শিক্ষার পরিপোষকরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

বিজ্ঞান ও গণিত সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

(৪) জাতীয়তাবোধ ও সমাজচেতনার অভাব—সাহিত্য ও ইতিহাসের মাধ্যমে এই জাতীয়তাবোধ, সমাজচেতনা ও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধকে উন্মেষিত করিতে না পারিলে সাহিত্য বা ইতিহাস পাঠ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

সাহিত্যের কার্য্য কেবল কল্পনাশক্তির উন্মেষ সাধনই নহে, শিশুর ভাবধারাকে সংহত করিয়া চিত্তের প্রসার সাধন করা ও মানব-প্রীতির উদ্বোধন করাও ইহার বিশেষ লক্ষ্য।

প্রকৃত জীবনের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ককে অনুভূতি-লোকে প্রতিফলিত করিয়া দিতে না পারিলে সাহিত্যের সার্থকতাই বিহিত হয় না।

অন্যদিকে ইতিহাসের মধ্য দিয়া দেশের ইতিহাস, সভ্যতার ঘাতপ্রতিঘাতের পটভূমিকায় একটি সামাজিক চেতনা বা জাতীয়তাবোধকে উদ্দীপিত করাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

সমাজচেতনার এই অভাব বর্ত্তমান যুগে এতই নিবিড়ভাবে অনুভূত হইতেছে যে অনেকে সমাজতন্ত্র শিক্ষাকে পাঠ্যবিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। কিন্তু মনে হয় যে পাঠ্যতালিকাকে অবান্তররূপে ভারাক্রান্ত না করিয়া ইতিহাস ও সাহিত্যের মাধ্যমে এই জাতীয়তাবোধ, মানবধর্ম্ম ও সমাজ-চেতনা উদ্বুদ্ধ করা যাইতে পারে।

(৫) শরীর ও চরিত্রগঠন, কৃষ্টি, সংগীত, অঙ্কন প্রভৃতি বিষয়েও বর্ত্তমান পাঠ্যতালিকায় যথাযথ দৃষ্টির অভাব আছে। কেবল মুখস্থ করিয়া কতকগুলি বিষয়কে আয়ত্ত করিতেই যদি ছাত্রগণ উৎসাহিত হয় তবে প্রকৃত শিক্ষার আশা কোথায় ?

(৬) ইহা ব্যতীত যে যে বিষয় পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহাদের মধ্যে অধিক সংহতি ও যোগসূত্র বর্ত্তমান থাকা উচিত।

কারণ, লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে হয় জীবজগৎ না হয় জড়জগৎকে কেন্দ্র করিয়াই বিভিন্ন বিষয়ের উদ্ভব এবং ইহাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই বিষয়বস্তুকে এইরূপ

সুবিন্যস্ত ও সংহতভাবে উপস্থাপিত করা উচিত যাহাতে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকটি বিষয়ে এই সম্পর্কনির্ণয়ের মধ্য দিয়া প্রকৃত আনন্দলাভ করিতে পারে। প্রত্যেকটি বিষয়কে একান্ত বিচ্ছিন্ন ও নীরসভাবে উপস্থাপিত করা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচায়ক।

(চ) পাঠ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য ও বর্ত্তমান দৃষ্টিভঙ্গীতে পাঠ্যতালিকার সংস্কার ঃ—

মোট কথা, শিক্ষার্থি-মনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যই যে পাঠ্যতালিকার আয়োজন—সে সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সচেতন থাকা প্রয়োজন।

মনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ বলিতে অনেক কিছুই বুঝায় তবে মোটামুটি নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে ইহাকে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) ধ্যান, ধারণা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ,

(২) যুক্তি ও তর্কক্ষমতার উন্মেষ,

(৩) গণনা ও হিসাব বিষয়ে তৎপরতা,

(৪) সমস্যা সমাধানে তৎপরতা আবিষ্কার ও গবেষণা-শক্তির ক্রমোন্মেষ ইত্যাদি ;

ইহা ছাড়া ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যতালিকার সংস্কারও বর্ত্তমানক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। কারণ এই দরিদ্র দেশে

শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নতিশীল দেশের ন্যায় উন্নত করা সময়-সাপেক্ষ ও অত্যন্ত ব্যয়-সাধ্য। তাই সমস্ত দিক বিচার করিলে ভারতের প্রাচীন খেলাধূলা (হা-ডুডু ইত্যাদি), তেঁতুল-বিচি, নাটাফল প্রভৃতির সাহায্যে গণনাশিক্ষার ব্যবস্থা, উন্মুক্ত স্থানে অধ্যাপনা, ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির সহিত নিবিড় পরিচয়-সাধন বর্ত্তমানে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে বাঞ্ছনীয়।

এই দিক হইতে প্রাচীনকালে যে **আলোচনা-সভা, কথকতা** প্রভৃতির নানাপ্রকার আয়োজন ছিল আজ তাহার পুনঃ-প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিক্ষার্থিজীবনের ক্রম-পরিণতি ও পাঠ্যতালিকা

মানবজীবনের ক্রমবিকাশের কতকগুলি পর্য্যায় লক্ষ্য করা যায়। পরিণতির পথে এই বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তনও প্রকট হইয়া উঠে। জীবনের এই রূপান্তর একান্ত স্বাভাবিক, ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, যে দিন শিশুর ধরণীর সহিত নূতন পরিচয় ঘটে সেইদিন হইতেই তাহার দেহ ও মনে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব অনুভূত হয়।

এই প্রভাবের ফলে জীবনের এক একটি বয়সে এক একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। তদনুযায়ী মানব-জীবনকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(১) শৈশব (প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর)
(২) বালকত্ব বা বাল্য
(৩) কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিক্ষণ
(৪) পরিণতি

(১) শৈশব

জন্মের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে মানুষের স্থির থাকিবার উপায় নাই। প্রথম তিন বৎসর শিশুর মনোরাজ্যে যে জগৎ সৃষ্ট হয় তাহা কেবল তাহার জননী বা অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু ক্রমশঃই তাহার অভিজ্ঞতার ডালি পূর্ণ হইতে থাকে। বাহিরের জগতের সহিত নিত্য নূতন পরিচয়ে বিস্ময় ও আনন্দে তাহার মনে ভাঙ্গাগড়া চলিতে থাকে। তাই চতুর্থ বৎসরে পদার্পণের পূর্ব্বে তাহাকে শিক্ষার্থী হিসাবে গণ্য করা চলে না। শিক্ষার্থীর প্রকৃত শৈশব সুরু হয় পঞ্চম বৎসরে এবং শেষ হয় ১২ বা ১৩ বৎসরে।

এই শৈশবের মধ্যে আবার দুইটি বিশেষ স্তর লক্ষ্য করা যায়। একে একে তাহাদের আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথম শৈশব (৫—৭)

দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য

সৃষ্টিতত্ত্ব সত্যই রহস্যময় ও জটিল। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে জীবনে শৈশবের খেলাধূলা, শৈশবের চিত্তবৃত্তি শৈশবের সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় লয় না। ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন ধারায় ইহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে পুনরায় জীবনে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়।

আকৃতিগত পার্থক্য

এই সময় শিশুর অবয়ব অত্যন্ত কোমল থাকে। এই ক্ষুদ্র শিশুর এবং বৃদ্ধের পরিণত রূপের মধ্যে ব্যবধান এতই বিরাট

যে অনেক সময় শিশু-বয়সের প্রতিকৃতি বৃদ্ধবয়সে চিনিতে অসুবিধা ঘটে। কিন্তু এই পার্থক্য কেবল আকৃতিগত বা দৈহিকই নহে, মনের দিক হইতেও বিপুল পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। তবে শৈশবে চিত্তবৃত্তির যে ক্রমিক রূপান্তর ঘটিতে থাকে দেহের দিক হইতেও অনুরূপ পরিবর্ত্তন ধারাবাহিকরূপে ঘটিতে দেখা যায়।

শিশুর চিত্তবৃত্তি

(১) শিশুরা কেবল আপনাকে ও জননীকেই জীবনের কেন্দ্র বলিয়া মনে করে, ফলে যদিও তাহারা সমবয়সীগণের সহিত খেলাধূলা করে, তবু কোন কিছু ঘটিলেই ত্রস্তপদে জননীর অঙ্কে মুখ লুকায়।

(২) এই পর্য্যায়ে তাহারা সর্ব্বদাই আবেগ ও উচ্ছ্বাসে ভরপুর থাকে এবং এই আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে সঙ্গে সঙ্গে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট হয়।

(৩) শিশুদের মন সত্যই ভাবপ্রবণ। প্রতিটি মুহূর্ত্তেই তাহাদের মনে নিত্যনূতন কল্পনার আবেশ ভিড় করে; এমন কি প্রকৃতি রাজ্যের প্রতিটি বস্তুই যেন তাহাদের বিস্ময় সঞ্চার করে, নূতন নূতন ভাবের তুফান আনিয়া দেয়।

(৪) কখনও তাহারা পরম কৌতূহলে ও দুর্ব্বার আবেগে আপনাকে প্রকট করিতে চাহে এবং আত্মবিস্তারের পথ খোঁজে এবং কখনও বা গভীর নৈরাশ্যে এবং আত্মাবমাননায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে।

(৫) অনেকেই মনে করেন যে শিশুদের মধ্যে যৌন লালসার কোন প্রভাবই নাই এবং এইখানেই নাকি শৈশবের সহিত জীবনের অন্যান্য পর্য্যায়ের বিশেষ পার্থক্য। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকগণের বিশেষ গবেষণার ফলে সেই ধারণার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহাদের মতে শিশুর যৌন-জীবন সত্যই বৈচিত্র্যময় ও বিশেষ সমৃদ্ধ। দেহসুখের প্রতি ইহারা বিশেষ সচেতন।

(৬) ক্রমশঃই ইহাদের আবেগ ও উচ্ছ্বাস দানা বাঁধিয়া সংহতরূপ গ্রহণ করে এবং এই দেহাত্মবোধ বহির্মুখী হইতে থাকে, ক্রমশঃ ইহাদের মন খেলাধূলার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

(৭) ইহা ব্যতীত আরও লক্ষ্য করা যায় যে বালকগণের নিকট মাতা ও বালিকাগণের নিকট পিতাই বিশেষ আনুগত্য লাভ করেন। ফ্রয়েড প্রভৃতি মনীষীর মতে এই বিপরীত রুচির মূলে নাকি বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক তথ্য বিদ্যমান।

শিশুর পাঠ্যতালিকা ও শিক্ষাব্যবস্থা

পাঠ্যতালিকার নির্ব্বাচন সত্যই সহজসাধ্য নয়। বিশেষ করিয়া শিশুর উপযোগী পাঠ্যনির্ব্বাচন করিতে হইলে শিশুমনের সহিত নিবিড় পরিচয়ের একান্ত প্রয়োজন।

(১) প্রথমতঃ এই বয়সে খেলাধূলার মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়াই বিশেষ বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিশুদের নিকট উপভোগ্য হইয়া উঠে, যথা—ছবি ও ছড়া,

কাঠের ব্লকের সাহায্যে বর্ণ-পরিচয়, নাটাফল বা অনুরূপ কোন বস্তুর দ্বারা গণনাশিক্ষা ইত্যাদি। নতুবা নীরস বিষয়বস্তু শিশু-গণকে ক্রমশঃ ক্লান্ত ও অবসন্ন করে।

(২) তাহাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে সজাগ রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন।

(৩) শিশুরা স্বভাবতই চঞ্চল। তাই তাহাদের হাতে-কলমে, ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। যাহাতে নিজেরাই হাতেকলমে আঁচড় কাটিয়া, কাঠের ব্লক সাজাইয়া, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। এক্ষেত্রে শিক্ষাদাতাকে বিশেষ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৪) কল্পনা বা ভাবের কথা বলা অপেক্ষা শিশুদের বস্তু-জগতের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়াই সমীচীন। কারণ তাহাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যতই নিবিড় করা সম্ভব হয় ততই পরিণাম কল্যাণকর। অবশ্য যদি শিশু সেই বস্তু-জগৎ হইতে নিজে কোনরূপ কল্পনা-সৌধ গড়িয়া তোলে তাহাতে বলিবার কিছুই নাই।

(৫) শিশুর রুচি ও খেয়ালের দিকে সজাগ দৃষ্টিও একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে ভবিষ্যতে নানা বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে। তাই সে যদি এই বয়সে খেলাধূলার প্রতি বিশেষ আসক্ত হয় তবে তাহাকে জোর করিয়া পড়াইবার বা লেখাইবার চেষ্টা করা বৃথা।

তবে তাহার যদি পঠন বা লিখন ব্যাপারে স্বাভাবিক কৌতূহল থাকে তাহা হইলে স্বতন্ত্র।

বর্ত্তমান লইয়াই সে বাঁচিতে চাহে—এই বয়সেই ভবিষ্যতের চিন্তা দিয়া তাহার সরল কোমল অন্তরকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলা কোনমতেই সমীচীন নহে।

(৬) সর্ব্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে পরিবেশের সহিত শিশু নিত্য সংস্পর্শে আসিতেছে তাহাই শিক্ষার প্রধান বিষয় হওয়া উচিত। কারণ, প্রকৃতি যে অন্যতম নিপুণ শিক্ষাদাতা—একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

(৭) তবে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করিয়া শিশুকে সরস ও স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে শিক্ষা দিলে তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

পাঠ্য বিষয়

শিশুবয়সের এই স্তরে পাঠ্যতালিকা নির্ব্বাচন করা অত্যন্ত বিবেচনা-সাধ্য। তাই ইহার কোন বাঁধাধরা নিয়ম লিপিবদ্ধ করা বোধ হয় সঙ্গত নহে। তবে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়-বস্তুর সন্নিবেশ শিশুশিক্ষার উপযোগী।

(১) ক্রীড়া-কৌতুক

(২) গল্প ও নানারূপ বীরত্বের কাহিনী

(৩) সংখ্যা গণনা

(৪) প্রকৃতি পরিচয় (অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশের

সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—জীব, জন্তু, ফল, ফুল প্রভৃতি সম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞানলাভ)।

সময় তালিকা :—

এই শ্রেণীর জন্য বিদ্যালয়ের সময়-তালিকার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা না করিয়া সপ্তাহের জন্য বা মাসের জন্য তালিকা প্রণয়ন করা সমীচীন। তবে বৎসরের কার্য্য-পরিকল্পনা অনুযায়ী এই তালিকা নির্দ্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং প্রত্যেকটি ঘণ্টা ২০ মিনিটের বেশী এবং সর্ব্বসমেত ৩ ঘণ্টার বেশী হওয়া মোটেই উচিত নহে।

শৈশবের দ্বিতীয় স্তর

ক্রমপরিণতির পথে এই স্তরে জীবনের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। মায়ের প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরতা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে এবং পরিবর্ত্তে সঙ্গলিপ্সা ও সমবয়সীদের সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা প্রবল হয়। একে একে আত্মনির্ভরশীলতা শিশুর মনে দানা বাধিতে থাকে এবং পথে ও প্রান্তরে সে অধিক আত্মপ্রত্যয়ের সহিত চলাফেরা করিতে আরম্ভ করে। আত্মবিস্তারের আর একটি প্রয়াস এই বয়সে বিশেষ ভাবে জাগরিত হয়—সে অন্যান্য সমবয়সীদের উপর প্রভাব বিস্তারের দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তাই দেখা যায় যে এই বয়সে যদিও সঙ্গলিপ্সা ও সমাজচেতনার সূত্রপাত হয়

তবু প্রবল স্বার্থবোধ তাহার এই সমাজচেতনার উন্মেষের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এই সময় আত্মত্যাগের আদর্শ তাহার এই স্বার্থবুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করে বলিলেও ভুল হয় না। বৃহত্তর সামাজিক দৃষ্টি অপেক্ষা দলগত স্বার্থই প্রবল হয় এবং গোষ্ঠী বা দলের প্রতি আনুগত্য ও একত্ব-বোধ এতই তীব্ররূপে শিশুদের মধ্যে দেখা যায় যে অনেক সময় গোষ্ঠী স্বার্থের জন্য ইহারা মিথ্যা বলিতে বা অন্যায় আচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

তবে সাধারণতঃ দেখা যায় যে জীবনের এই স্তরে ছাত্রগণ অন্যের মতামতের উপর বিশেষ নির্ভর করে ; সর্ব্বদাই তাহারা সাধারণের মন্তব্য সম্পর্কে সচেতন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শৈশবের এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে শিশু হৃদয়ে নীতিবোধ জাগ্রত হইয়া ওঠে। সহজে কোন দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া ইহাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ইহা ব্যতীত একটি বহির্মুখী সারল্য ও প্রগল্‌ভতা ইহাদের অধিকাংশের মধ্যেই লক্ষিত হয়। তাই বর্হিজগৎ সম্পর্কে অনন্ত কৌতূহল ও অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের খেলাধূলায় আগ্রহ তাহাদের মধ্যে পরিপুষ্ট হইতে দেখা যায়।

এই সময় সব জিনিষ মুখস্থ রাখিবার একটি আকুলতা দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের এই মুখস্থ-বিদ্যা উপলব্ধির উপর নির্ভর করে না, কেবল শব্দের অনুকরণে অন্ধ অনুশীলনই ইহাদের লক্ষ্য হইয়া থাকে।

পাঠ্যতালিকা

(১) গণিত—যাহাতে গুণ, ভাগ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া গণনা শিক্ষা বর্দ্ধিত হইতে পারে তাহার জন্য অনুশীলনীর ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। গুণন তালিকা প্রভৃতির আয়োজন এই সময় বিশেষ কার্য্যকরী।

(২) পৌরাণিক গল্প ও প্রাচীন কাহিনী—এই স্তরের বিশেষ উপযোগী। তবে যে সব গল্পে বিশেষ বিভীষিকা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে তাহা বর্জ্জন করাই সমীচীন।

(৩) প্রকৃতি পাঠ

একটি ধারাবাহিক সুসংহত পুস্তিকা ইহাদের অবশ্য-পাঠ্য করা উচিত। যাহাতে ক্রমশঃই বহিঃপ্রকৃতির সহিত শিশুদের নিবিড়তর পরিচয় ঘটে পুস্তকগুলি তদ্রূপ বৈচিত্র্যময় ও প্রাঞ্জল হওয়া উচিত। তবে ইহাকে প্রথমেই বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে না ফেলিয়া বিজ্ঞান পাঠের প্রাথমিক সোপানরূপে ব্যবহার করাই সমীচীন।

ভূগোল—

ভূগোল বলিতে কি বুঝায়,—তাহা বিশ্লেষণ করিয়া ম্যাপ অঙ্কনের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্য দিয়া বিষয়বস্তুকে সরস করিতে হইবে। পল্লী, নগর, জিলা, অধিবাসী প্রভৃতি প্রাথমিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাহাদের পারিপার্শ্বিক স্থানের মাধ্যমে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়াই

বাঞ্ছনীয়। যাহাতে প্রকৃত বিষয় না বুঝিয়া ও না শিখিয়া ছাত্রগণ কেবল মুখস্থ করিতে না পারে তাহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে মানব-সভ্যতার ক্রমপরিণতির পথে ভূগোলের প্রয়োজনবোধ গল্প, ভ্রমণকাহিনী বা ম্যাজিক লণ্ঠনের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীর মনে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে এবং বিষয়বস্তুর প্রতি একটি অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে আলোকচিত্র এই সব বিষয়বস্তুকে বিশেষ সরল ও উপভোগ্য করিবার পথে বিশেষ কার্য্যকরী।

ভাষা, সাহিত্য ও সঙ্গীত—

মানব জীবনে সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রভাব কখনই অস্বীকার করা যায় না। তাই এই বয়স হইতেই শিশুকে ভাব বিনিময়ের জন্য সুষ্ঠুভাবে বলিতে, শিখিতে এবং ক্ষেত্র অনুযায়ী গান গাহিতেও শিক্ষা দেওয়া উচিত।

শিল্পকলা বা নূতন বিদেশী ভাষা শিক্ষার সূত্রপাত এই বয়স হইতেই সুরু করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা না হইলে পরবর্ত্তী স্তরে উচ্চারণগত ত্রুটির সংশোধন সহজসাধ্য নহে।

এই সঙ্গে গৃহকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্যও একটি নির্দ্দিষ্ট সময় করিয়া লইলে ভালো হয়।

সময়-তালিকা

ছাত্রগণকে এই বয়সে চার ঘণ্টার অধিককাল বিদ্যালয়ে আবদ্ধ রাখা চলে না এবং ইহার মধ্যে অন্ততঃ আধঘণ্টার

অবকাশ দেওয়া উচিত। বিষয়ের গুরুত্ব দেখিয়া এই সময়-তালিকা প্রণয়ন করাই যুক্তিযুক্ত।

(২) বালকত্ব বা বাল্য

(১) জীবনের এই স্তরটিকে বয়ঃসন্ধিক্ষণের পূর্ব্বাভাষ বলা চলে। এই সময়ে মানসিক স্থৈর্য্য বা ভাবসাম্য বিশেষ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার পর আবার এই স্থৈর্য্য ব্যাহত হয় এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শৈশবের বৃত্তিগুলি যেন পুনরাবৃত্ত হইতে থাকে।

(২) আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মচেতনা, কর্ম্মক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, অজানাকে জানিবার কৌতূহল ও সর্ব্ব বিষয়ে বিশেষ ঔৎসুক্য এই সময়ে প্রকট হইয়া উঠে।

(৩) আবেগের আবর্ত্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মন বাস্তববাদী দৃষ্টি লাভ করে।

(৪) স্ত্রী জাতির প্রতি একটি স্বাভাবিক বিমুখতা ও ঔদাসীন্য বালকত্বের এই পর্য্যায়ে দেখা দেয়।

পাঠ্যতালিকা

পাঠ্যতালিকা নির্ব্বাচনের ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়ের ক্রম-বিন্যাস ও পারস্পরিক সংহতিসাধন ও যোগাযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

ইতিহাস

সভ্যতার সুরু হইতে কি ভাবে মানুষ ইতিহাস রচনা করিয়া চলিল, তাহা সাবলীল ভাবে গল্পে, কথায়, চিত্রে ও সম্ভব হইলে আলোকচিত্রে উপস্থাপিত করিতে পারিলে ইতিহাস পাঠ সত্যই সার্থক হইয়া উঠে।

ভূগোল

নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ সঙ্কীর্ণতর পরিবেশ হইতে ক্রমশঃ বৃহত্তর পরিবেশের সহিত পরিচয়ের মধ্য দিয়া ভূগোল শিক্ষা দেওয়াই বিধেয়। মানচিত্রের ব্যবহার শিক্ষা এই পর্য্যায়ে বাঞ্ছনীয়।

গণিত

সরল হইতে জটিল পদ্ধতির মধ্য দিয়া গণিতের উপস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত।

সাহিত্য—কবিতা

সুকবি ও সুসাহিত্যিকদের সহিত ক্রমশঃ পরিচয় করাইয়া দেওয়া, অভিধানের ব্যবহার শিক্ষা, ছোট ছোট উপযোগী নীতিগল্প ও ভ্রমণকাহিনী পরিবেশন করা এই পর্য্যায়ে সত্যই বাঞ্ছনীয়। এই সময় হইতে নীরব পাঠ অভ্যাস করিবার জন্য ছাত্রগণকে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

প্রকৃতি-বিজ্ঞান

পূর্ব্বের ন্যায় এই পর্য্যায়েও প্রকৃতি-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত। তবে বিভিন্ন স্তরভেদে ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাদের উপস্থাপন বিশেষ ফলপ্রদ।

ব্যাকরণ

ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন, তাই এই স্তরে ভাষা বিশ্লেষণের জন্য ব্যাকরণশিক্ষা বিশেষ উপযোগী। কিন্তু কেবল ব্যাকরণের জটিল সূত্র মুখস্থ না করাইয়া সাহিত্য ও ভাষার মাধ্যমে ইহার প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের প্রতি ছাত্রগণকে আকৃষ্ট করাই অধিক বাঞ্ছনীয়।

সঙ্গীত, নাটক—অঙ্কন—শিল্পকার্য্য ইত্যাদি ঃ—

শিক্ষার ক্রিয়া-কেন্দ্রিকতার দিকে লক্ষ্য করিলে শিল্প, সঙ্গীত, নাটক ও অঙ্কনের বিশেষ সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

শরীরচর্চ্চা ও ধর্ম্ম শিক্ষা

(১) আমাদের শিক্ষা আজও শরীরচর্চ্চার দিকে উদাসীন বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। তাই শরীর গঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

(২) শিক্ষার্থিজীবনের এই পর্য্যায়ে ধর্ম্মভাব উন্মেষিত হয়। যাহাতে তাহার অপমৃত্যু না ঘটে সেজন্য কোন বিশেষ ধর্ম্ম শিক্ষা না দিয়া মোটামুটি জীবনের নীতি ও মানবের সম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষার্থীর চিত্তে অনুভূতি সঞ্চার করা শ্রেয় বলিয়া মনে হয়।

(৩) কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিক্ষণ

জীবনের পথে নিরন্তর ভাবসংঘাতের আবর্ত্তে মানবশিশু ঘুরপাক খাইতে থাকে। শিশুবয়সে যেরূপ অসহায় ভাব ও সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা তাহাকে বারংবার বস্তুজগতে সংগ্রাম ও দ্বন্দ্ব আনিয়া দিয়াছিল সেইরূপ কৈশোরের এই প্রারম্ভেই ভাবজগতে তাহার সেই অসহায় ভাব প্রকাশ পায়। তাহার নিকট সমগ্র পরিবেশ যেন নূতন ও রহস্যময়রূপে ধরা দেয়।

শৈশবের পর বালকত্বের সময় যে স্থৈর্য্য ও ভাবসাম্য দেখা দিয়াছিল তাহারও অভাব দেখা দেয়—যেন সেই জগতের সহিত পরিচিতি ও তদনুযায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণের যেটুকু অগ্রগতি ঘটিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণরূপে ভাঙন ধরে। কি দেহে ও অবয়ব-গঠনে, কি মানসিক বৃত্তিতে, কৈশোর মানবজীবনে যে আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এইজন্য এই সংকট মুহূর্ত্তটিকে অনেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণ বলিয়া থাকেন।

বিশেষ বিশেষ দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন এই পর্য্যায়ে লক্ষিত হয়ঃ—

দেহগত পরিবর্ত্তন ঃ—

(১) শরীরের দৈর্ঘ্য ও ভার বৃদ্ধি

(২) অস্থিগুলির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি

(৩) অস্থি-সংযোগস্থলের বা অস্থিসন্ধির দৃঢ়বন্ধতা

(৪) পুরুষ বা স্ত্রীজাতির সৃজনাবয়বের পরিবর্দ্ধন

(৫) সঙ্গ ও সংভোগশক্তির উন্মেষ

(৬) কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন

চিত্তবৃত্তির দিক হইতেও কৈশোরকে জীবনের এক 'বিপর্য্যয়-মূহূর্ত্ত' বলা চলে। নানা ভাবসংঘাতের ঝঞ্ঝা ও দুর্য্যোগ বহন করিয়া, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়া কিশোরগণের পরিণতি ঘটে।

(১) আবেগ ও উচ্ছ্বাস, কল্পনা ও প্রবণতা প্রতিটি মুহূর্ত্তে ইহাদের মনকে উচাটন করিয়া তোলে।

তাই দেখা যায়, কখনও দুর্জ্জয় সাহস ও আত্মপ্রত্যয়, আবার কখনও গভীর হতাশা ও বিষাদ কিশোরগণকে স্থৈর্য্যহীন করিয়া তোলে। তাহাদের মন যেন আনন্দ-বেদনা ও আশা-নৈরাশ্যের দোলায় দুলিতে থাকে।

(২) আত্মচেতনা ও আত্মকেন্দ্রিকতা এই বয়সের আর একটি ধর্ম্ম। পরিবেশকে সে কখনও অনুকূল বলিয়া ভাবিতে পারে না, এমন কি—সকলেই যেন তাহার গতিবিধি ও আচরণের দিকে বিশেষ সজাগ ও অসহানুভূতিশীল এইরূপ একটি ধারণার ফলে তাহার আপনার প্রতি সজাগদৃষ্টি ও চেতনার অবকাশ ঘটে।

(৩) ফলে সে যেন পূর্ব্বের সেই শৈশবাবস্থা আবার ফিরিয়া পায়। তাই বাস্তব জগৎ হইতে আপনাকে গুটাইয়া লইয়া সে আপনাকে আপনার জগতের নায়কের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। বাহিরের জগতের সহিত নিরন্তর সংঘাতে মাঝে মাঝে দিশাহারা হইয়া আপনাকে অসহায় ও শিশুর ন্যায় নির্ভরশীল বলিয়া মনে করে।

(৪) কিন্তু এই কিশোর বালক আপনাকে কখনও হীন বলিয়া মনে করিতে পারে না। তাই নৈরাশ্য ও হতাশার পরে আবার সে দুর্ব্বার অভিযান সুরু করে। নিয়মশৃঙ্খলাকে ভাঙিয়া ফেলিবার দুর্দ্দম প্রবৃত্তি তাহার মনে বিশেষভাবে আত্ম-প্রকাশ করে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ভিন্ন অধিকাংশ বয়স্ক অভিভাবক, এমন কি শিক্ষকের প্রতিও সে মনে মনে বিক্ষোভ পোষণ করে। কিন্তু বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মহান্ উজ্জ্বল আদর্শের নিকট তাহারা সহজেই নতি স্বীকার করে।

(৫) সে আপনাকে লইয়া যে জগৎ গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পায় তাহা যেন রূঢ় বাস্তবকে উপেক্ষা করিতে চাহে। কল্পনাশক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া সে যেন যুক্তিবাদী ও সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে। তাই কোন বিষয়কে সহজে বিশ্বাস করিয়া লওয়া ইহাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ।

(৬) যৌন প্রবৃত্তি এই বয়সের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তাই সমবয়সী বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সৌহার্দ্দের মধ্যেও একটি লালসা ও যৌনলিপ্সা প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

বিপরীত শ্রেণী বা জাতির (লিঙ্গ) প্রতি যৌনলালসা-মিশ্রিত আকর্ষণ অবশ্য সমজাতীয় প্রীতি অপেক্ষা প্রবলতর হয়। সর্ব্বদাই নিজের শরীর ও অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতি কৌতূহল উঁকি দেয় এবং তাহার মূলেও বোধ হয় এই যৌনপ্রবৃত্তি কার্য্য করিয়া থাকে। এই যৌনলালসা অনেক সময় এমনই তীব্র হইয়া ওঠে যে ইহা তাহাদের বিবেচনাশক্তিকে ম্লান করিয়া দিয়া অধিক-বয়স্কা রমণীর প্রতিও তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করে।

(৭) সংঘপ্রিয়তা ক্রমে সমাজপ্রীতিতে রূপান্তরিত হইবার সুযোগ খুঁজিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে সে সমাজের মধ্যে একটি স্থান করিয়া লইতে চাহে এবং অনেকের মতে ধর্ম্ম বা কর্ম্ম, বীর্য্য বা আধ্যাত্মিকতার আদর্শ এই বয়স হইতেই অঙ্কুরিত হয়। তাই অনেক সময় 'বীরপূজা' বা অনুরূপ আদর্শের চেতনায় তাহাদিগকে বিশেষ আগ্রহান্বিত দেখা যায়। কিন্তু যৌন-প্রবৃত্তি যেন তাহাদের জীবনের এই স্তরটি জুড়িয়া কেন্দ্রীভূত চুম্বকশক্তির ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে। মোট কথা, বয়ঃসন্ধিক্ষণ মানব জীবনের একটি সংকট মুহূর্ত্ত, তাই এই বয়সকে যে অনেকে 'ঝঞ্ঝা ও বিপর্য্যয়ের কাল' বলিয়া থাকেন তাহা একান্ত অসঙ্গত নহে।

পাঠ্যতালিকা

কিশোরগণের পাঠ্যতালিকা প্রণয়নে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। একটি মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মবিশ্লেষণ ভিন্ন এই তালিকা

নির্ব্বাচন সার্থক হইতে পারে না। তাই এইবার পাঠ্যনির্ব্বাচনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

(১) মাতৃভাষা ও সাহিত্য

মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্যের অনুশীলন এবং সাহিত্যিক রসবোধের উন্মেষণা কৈশোরের পরম উপযোগী, কারণ ইহাদের মনে যে কল্পনাবিলাস ও উচ্ছ্বাস প্রবলরূপে আত্মপ্রকাশ করে তাহা সাহিত্য ও কাব্যের মাধ্যমে পথ খুঁজিয়া পায়। মাতৃ-ভাষার সাহায্যে ধ্যান ও ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে এবং আত্ম-প্রকাশের শক্তি বর্দ্ধিত হয়। তাই অন্যান্য ভাষাকে উপেক্ষা না করিলেও প্রথমে মাতৃভাষার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সমীচীন।

(২) কয়েকটি বিদেশী ভাষার সহিত পরিচিতিও এই বয়সে অপরিহার্য্য। দেশ-বিদেশের সাহিত্য, দেশ-বিদেশের কথা ও গল্প, চিন্তাধারা ও বর্ণনা এই সব 'দেশের আশাস্থল' কিশোরদের মনকে সজীব করে ও তাহাদের মননশীলতাকে বলিষ্ঠ করিয়া তোলে।

(৩) ইতিহাস ও ভূগোল

দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপের সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়ার পক্ষে ইহাই প্রকৃত অবসর। দেশকে ভালোভাবে জানিবার জন্য ও সভ্যতার ধারার সহিত পরিচিতির উদ্দেশ্যে যেমন ইতিহাসপাঠের প্রয়োজন অন্যদিকে আপনার

দেশের পরিস্থিতি, তাহার সীমা, লোকের আচার-ব্যবহার, বাণিজ্যিক যোগসূত্র ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত তাহার তুলনামূলক আলোচনাও এই স্তরে বিশেষ বাঞ্ছনীয়। কারণ, ইহার পরবর্ত্তী স্তরে হয়ত বিশেষ কোন বিদ্যার শাখাকে অধিগত করিবার জন্য ছাত্রগণের সময় নিয়োজিত হইতে পারে। তাই যাহাতে প্রত্যেকেই অন্ততঃ পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভ করিয়া নাগরিকের উপযোগী হইতে পারে তাহার জন্য এই বয়সে ভূগোল অধ্যয়ন ও তাহার যথাযথ শিক্ষণের সার্থকতা আছে।

গণিত—জ্যামিতি—ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি—

কল্পনার বিকাশ সাধনেরও যেরূপ উপযোগিতা আছে ধীশক্তিকে সূক্ষ্ম, মার্জ্জিত এবং অভ্রান্তভাবে পরিচালিত করিবার উপযোগিতাও ততোঽধিক। বিশেষ করিয়া এই বয়সে এইরূপ অধ্যয়নে তাহাদের মন কল্পনা-প্রবণতা হইতে বাস্তবের অভিমুখী হইবার অবসর পায়। তাই গণিতশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা ও বাস্তবের ক্ষেত্রে ইহাদের উপযোগিতা বিশ্লেষণ একান্ত যুক্তিযুক্ত।

বিজ্ঞান—(প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও প্রয়োগ-বিজ্ঞান)

বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। যাহাতে বাস্তবজীবনে ও দৈনন্দিন চলার সাথে অতি সাধারণ বৈজ্ঞানিক

জ্ঞানের অভাবে শিক্ষার্থীকে অসুবিধায় না পড়িতে হয় এইজন্য প্রকৃতি-বিজ্ঞানে ও বিশেষ করিয়া প্রয়োগ-বিজ্ঞানে তাহার প্রাথমিক জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। সংসারের ক্ষেত্রে উপযোগী ও নির্ভরশীল হইবার পক্ষে এই শিক্ষা অপরিহার্য্য। অবশ্য অনেকের মতে ভবিষ্যতে যে যেরূপ শিক্ষা লাভ করিতে চাহে সেই পথ অনুযায়ী তাহাকে শিক্ষা দেওয়াই সমীচীন। যাহার ভাষা বা সাহিত্যের দিকে প্রবল অনুরাগ ও আকর্ষণ তাহার বিজ্ঞান শিক্ষার সার্থকতা কি ? ইহাই তাহাদের প্রশ্ন।

কিন্তু—যুগোপযোগী শিক্ষার আলোকে সংসারের পথকে উদ্ভাসিত দেখিতে হইলে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা চলে না। তবে এই কৈশোরের শেষ ধাপে শিক্ষার্থিগণের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিষয়বস্তুর বিন্যাস করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে শিল্পকলা, অঙ্কন, গণিত, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে যাহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা ও অনুরাগ আছে বা যাহাদের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ আছে তাহাদের সেই অন্তরের জ্ঞানপিপাসাকে চরিতার্থ করিবার ব্যবস্থা এই স্তরেই অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

এই রুচির যথাযথ পরিপোষণের জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। বিজ্ঞান, অন্য ভাষা বা শিল্পকলা, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের প্রত্যেকটিকে অধিগত করা একই সময়ে সম্ভবপর নহে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাই মনের সহজ প্রবণতা অনুযায়ী ইহাদিগকে ঐচ্ছিক করাই বিধেয়।

বয়ঃসন্ধিক্ষণে বিশেষ শিক্ষা

বয়ঃসন্ধিক্ষণে যাহারা পদার্পণ করে তাহাদের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা অবলম্বন করাই সমীচীন।

প্রথমতঃ—অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত ও ইহাদের সুখসুবিধার প্রতি প্রখর দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ—যৌনশিক্ষা (Sex Education) ইহাদের নিকট একান্ত অপরিহার্য্য। একান্তে আনিয়া স্পষ্টভাবে গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্যের সহিত ইহাদের নিকট যৌনরহস্যের উন্মোচন করিয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ সতর্কবাণী ও নির্দ্দেশ দেওয়া উচিত।

তৃতীয়তঃ—বেশভূষার পারিপাট্য ও শুচিতা, স্নান ও দেহের মালিন্য মুক্তি, কঠিন শয্যায় শয়ন করিতে দেওয়া প্রভৃতি বিশেষ কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কিশোরদের শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিক্ষক

সংকেত—

শিক্ষকের সংজ্ঞা—শিক্ষকের সহিত শিক্ষার্থীর সম্পর্ক—শিক্ষার যোগ্যতা ও গুণাবলী—শিক্ষকের দায়িত্ব ও সমাজে তাহার প্রভাব—জাতিগঠনে শিক্ষকের কর্ত্তব্য—শিক্ষকের শিক্ষা।

(ক) শিক্ষাতরণীর কর্ণধার শিক্ষক

যদিও বর্ত্তমানে শিক্ষকের স্থান ও কার্য্য সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দিয়াছে তবুও শিক্ষককে কেন্দ্র করিয়া আজও সমগ্র শিক্ষাজগৎ আবর্ত্তিত হইতেছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

জীবনে শিক্ষাদানের পবিত্র কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী তাঁহাদিগকেই শিক্ষক আখ্যা দেওয়া হয়। ব্যাপক দৃষ্টিতে প্রকৃতি হইতে সুরু করিয়া প্রায় প্রতিটি প্রাণীই এই শিক্ষকের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে শিক্ষাদান কার্য্যের ন্যায় দুষ্কর কার্য্য খুব অল্পই আছে। মানবের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে হৃদয়ের সূক্ষ্মতন্ত্রীতে আঘাত হানিয়া তাহাকে স্পন্দিত করার প্রয়োজন। তাই

প্রকৃত শিক্ষাদান একটি বিশেষ কলানৈপুণ্য ভিন্ন সম্ভবপর নহে। মহান্ আদর্শের স্পর্শে শিক্ষার্থি-জীবনকে ক্রমপরিণতি অর্পণ করার শক্তি যাঁহার আছে তিনিই প্রকৃত শিক্ষক। তাই যাঁহারা প্রকৃত শিক্ষক তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি উজ্জ্বল ও বিরাট শক্তির অধিকারী—আশা ও উদ্দীপনার উৎস এবং শিক্ষার্থিগণের পথনির্দ্দেশক ও একান্ত নির্ভরস্থল। শিক্ষা-জগতে শিক্ষককে ধ্রুবতারার সহিত তুলনা করা চলে। তিনিই শিক্ষার্থীর জীবনপথে কখনও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া, কখনও কঠোর শাসনের দ্বারা, সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, বিপর্য্যয়ে ও উৎসবে প্রকৃত অধিনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত হন। সমস্ত পরিবেশকে মধুর ও অনুকূল করিয়া তুলিবার দায়িত্ব শিক্ষকের। ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে, প্রজ্ঞার শিখায় চলচপল ছাত্রচিত্তে নব নব চেতনা, মহীয়ান্ আদর্শ, বিরাট কর্ম্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে যিনি উপযুক্ত তাঁহাকেই শিক্ষকের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা যায়। **শিক্ষকই বিদ্যালয়ের প্রাণ এবং সাক্ষাৎ বাণীমূর্ত্তি।** জীর্ণ পর্ণকুটিরও বিরাট পুরুষের অপূর্ব্ব প্রভাবে শ্রেষ্ঠ বাণীমন্দিরের গৌরব লাভ করিতে পারে। তাই দেখা যায় যে শিক্ষকের বিরাটত্বের স্পর্শে প্রাচীন ভারতে তপোবনের শিক্ষা কতদূর সার্থক হইয়াছিল ও কত মনীষার জন্ম দিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ বিরাট বিরাট প্রাসাদোপম বিদ্যানিকেতনের অন্তরালে অনুরূপ শিক্ষার বীজ উপ্ত হইতেছে কি না সন্দেহ।

(খ) শিক্ষকের সহিত শিক্ষার্থীর সম্পর্ক

শিক্ষকের সহিত শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নিরূপণ করা সত্যই সহজসাধ্য নহে। কারণ শিক্ষার্থি-জীবনের বিভিন্ন স্তরভেদে শিক্ষকের সহিত শিক্ষার্থীর সম্পর্কের রূপান্তর ঘটিতে থাকে। শিক্ষক কখনও বা শিক্ষার্থীর পালক ও অভিভাবক, কখনও জননীর ন্যায় সান্ত্বনা ও শান্তির উৎস, আবার কখনও বা বন্ধুর ন্যায় হিতৈষী ও প্রিয়। তাই শিক্ষার্থি-শিক্ষকের মধ্যে যে প্রকৃত সম্পর্ক তাহা সত্যই মধুর ও বৈচিত্র্যময়। শৈশবে শিক্ষকের সহিত শিক্ষার্থীর সম্পর্ক যেমন স্নেহরসে স্পৃষ্ট হওয়া উচিত, অন্যদিকে প্রকৃত হিতৈষণার বুদ্ধি সর্ব্বদাই শিক্ষকচিত্তে জাগ্রত থাকা বাঞ্ছনীয়। পরবর্ত্তী স্তরে অর্থাৎ বালকত্বপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককে দৃঢ়তার সহিত শিক্ষার্থিচিত্ত নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, শাসন-শৃঙ্খলা, সতর্ক দৃষ্টি এবং মাঝে মাঝে স্নেহপূর্ণ নির্দ্দেশে শিক্ষার্থিচিত্তের জ্ঞানোন্মেষ ঘটাইতে হইবে। পরে কৈশোরে পদার্পণের সঙ্গে এই সম্পর্ক অধিক দরদপূর্ণ ও সহানুভূতিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত কঠোরতা ও দৃঢ়তা অপেক্ষা সমবেদনা ও সহানুভূতিই এই সম্পর্ককে মধুর করিয়া তোলে। সত্যই তাহাদের শুভানুধ্যানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে ইহা অতি সুফলদায়ক রূপে দেখা দেয়। ইংরেজীতে যাহাকে Sympathy, Suggestion এবং Imitation বলে (বাংলায় যথাক্রমে অনুভাবন, অনুমনন ও অনুকরণ) সেই ত্রয়ীর যথাযথ প্রয়োগে শিক্ষক-

শিক্ষার্থীর সম্পর্কবিভ্রাট সহজ হইয়া আসে। বর্ত্তমানে ভারতীয় বিদ্যালয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সম্পর্কের মধ্যে মাধুর্য্য ও সহজভাবের অভাব দেখা দিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায় যে এই সমস্যার মূলে রহিয়াছে শিক্ষকের চাতুর্য্যের অভাব ও ত্রুটি এবং বাহিরের অন্যান্য প্রভাব। অনেকে শিক্ষককে এইরূপ আদর্শের ও গুণাবলীর অধিকারী রূপে কল্পনা করেন যে শিক্ষক যেন এক অভিনব অপার্থিব সৃষ্টি, ফলে শিক্ষকের স্বাভাবিক সত্তা হারাইয়া যায়। কিন্তু ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। তাঁহার মানবিকতাকে বিস্মৃত হইয়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ ও হৃদয়সম্পদের সমষ্টিরূপে শিক্ষককে কল্পনা করা প্রকৃতই হাস্যকর। মানুষের পক্ষে যাহা শোভনীয়, মানবজীবনের পক্ষে যতখানি উৎকর্ষলাভ সম্ভবপর তাহার প্রতিফলন শিক্ষক-চরিত্রে শোভনীয়। তাই তাঁহার জীবনে স্খলন পতন বা ত্রুটি যে একেবারেই অস্বাভাবিক তাহা বলা অযৌক্তিক।

(গ) শিক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবলী

বর্ত্তমানে শিক্ষার ধারা, শিক্ষার গতি বিশেষ জটিল রূপ পরিগ্রহণ করিতেছে। শিক্ষার প্রাচীন রূপ, শিক্ষা সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণা আজ পরিবর্ত্তিত। তাই শিক্ষাধারার এই বিপুল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককেও অনুরূপ যোগ্যতা

অর্জ্জন করিতে হইবে। বৃহত্তর জীবনের প্রভাব, সামাজিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক পরিবেশ শিক্ষাধারাকে ক্রমশই জটিল করিয়া দিতেছে। এই কঠিন স্রোতে শিক্ষাতরণীকে তীরে উপনীত করিবার দায়িত্ব যাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে সেই শিক্ষক-সমাজের অনুরূপ যোগ্যতা না থাকিলে মঙ্গলের আশা কোথায় ? তাই কালস্রোতের এই পরিবর্ত্তনশীল পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য্য মুষ্টিমেয় গুণাবলী ও যোগ্যতার বিবরণ দেওয়া সমীচীন না হইলেও একটি স্থূল মাপকাঠির প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মোটামুটি শিক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবলী নিম্নোক্ত পর্য্যায়ে লিপিবদ্ধ করা চলে।

(ক) শিক্ষকের মানবিক যোগ্যতা (শারীরিক ও মানসিক);

(খ) শিক্ষকের শিক্ষণকার্য্যে যোগ্যতা ও গুণাবলী ;

(গ) শিক্ষকের পরিচালনাকার্য্যে ও শাসন বা শৃঙ্খলা-বিধানে যোগ্যতা ;

শিক্ষকের মানবিক (শারীরিক ও মানসিক) যোগ্যতা বা মানুষ হিসাবে শিক্ষকের শোভনীয় গুণাবলী ও যোগ্যতা :—

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এই শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইয়া বিশেষ বিড়ম্বনার সম্মুখীন হন।

অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা সত্ত্বেও তাঁহাদের শিক্ষক জীবনে বিফলতা আসিয়া যায়। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে জ্ঞানের সহিত জ্ঞানদান কার্য্যের যোগাযোগকে অস্বীকার করা না যাইলেও অন্যান্য যোগ্যতা না থাকিলে শিক্ষক হিসাবে কৃতিত্ব অর্জ্জন করা যায় না। হয় তাঁহারা মানুষ হিসাবে শিক্ষার্থিচিত্তে কোন প্রকার স্পন্দন জাগাইতে পারেন না, না হয় তাঁহাদের কোন প্রকার শারীরিক বৈক্লব্য ও বিকৃতি বর্ত্তমান। তাই শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা ও স্থৈর্য্য শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য্য। একে একে সেগুলির বিশ্লেষণ নিবদ্ধ হইল।

(১) শারীরিক সুস্থতা ও কর্ম্মক্ষমতা

শিক্ষকের শারীরিক সুস্থতা ও সংযম, সজীবতা এবং সপ্রতিভতা না থাকিলে তাঁহার পাঠন ছাত্রগণের নিকট কখনও চিত্তাকর্ষক হয় না। তাই শিক্ষকগণের শরীরের দিকে ও বেশভূষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। সুন্দর আকৃতি ও স্বাস্থ্য ছাত্রগণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করে।

(২) সাহস, বীর্য্য ও দৃঢ়তা

সাধারণতঃ লক্ষিত হয় যে, যে শিক্ষকের চরিত্রে দৃঢ়তা, বক্ষে সাহস এবং সৎকার্য্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা আছে তিনি সহজেই ছাত্রগণের চিত্ত জয় করিতে পারেন। এগুলির অভাব অনেক সময়ে শিক্ষাদানের পথে বিশেষ অন্তরায় হয়।

(৩) রসবোধ, অমায়িকতা ও আন্তরিকতা

রসবোধ জীবনের একটি বিশেষ সম্পদ। ইহার অভাবে মানুষের জীবন ছন্দোহারা হইয়া পড়ে। তাই শিক্ষকেরও এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতে বঞ্চিত হওয়া বিশেষ দুর্ভাগ্যের কারণ রূপে বিবেচিত হইতে পারে। শিক্ষকজীবনে চরিত্রের দৃঢ়তা এবং সঙ্কল্পেরও যেরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে, অমায়িকতা, সারল্য এবং আন্তরিকতারও সেইরূপ মূল্য আছে। এই বিশিষ্ট গুণাবলী শিক্ষকের জীবনে পরম সম্পদ এবং ছাত্রগণের সহিত মধুর সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

তাই অনুদার, কৃপণ, আন্তরিকতাহীন ও রুক্ষপ্রকৃতি শিক্ষক বিরাট জ্ঞানের অধিকারী হইয়াও ছাত্রগণের শ্রদ্ধা দাবী করিতে অসমর্থ হন।

(৪) আশাবাদী মন—মানসিক স্থৈর্য্য ও স্নিগ্ধতা

শিক্ষকের পক্ষে আশাবাদ বাঞ্ছনীয়। গভীর হতাশার মধ্যে আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা দুষ্কর হইলেও শিক্ষার্থীর দিকে তাকাইয়া আশ্বাসোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে সর্ব্বদাই ছাত্রগণকে উদ্দীপনা যোগান শিক্ষকের কর্ত্তব্য। মানসিক স্থিরতা ও স্নিগ্ধতা, প্রশান্তি ও কমনীয় রূপ শিক্ষার্থিহৃদয়ে যে শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলে তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

(৫) আদর্শবাদিতা ও ব্যক্তিত্ব

শিক্ষকের জীবন সর্ব্বদাই এক উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইলে

তাঁহার ব্যক্তিত্ব অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। শিক্ষকের জীবনে এই আদর্শ ও শিক্ষাব্রত যতই প্রবল হইবে ততই আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তিনি সকলের মর্য্যাদালাভে ধন্য হইবেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে মানসিক স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তাএবং একটি নির্দ্দিষ্ট আদর্শ ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে এবং সেই ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে বিদ্যানিকেতন উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

শিক্ষণকার্য্যে শিক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবলী

এইবার শিক্ষাদাতা হিসাবে শিক্ষকের কি কি গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

(১) যে বিষয়ে শিক্ষক অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিবেন সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন।

(২) কেবল ব্যুৎপত্তি থাকিলেই চলিবে না, বিষয়টীকে সহজ ও সরসভাবে উপস্থাপিত করিবার কৌশল ও যথাযথ প্রকাশভঙ্গী শিক্ষকের অধিগত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(৩) **উপস্থাপনপ্রণালী, বাচনভঙ্গীর নৈপুণ্য** ও শৃঙ্খলা বিধানে যোগ্যতা শিক্ষকের গুণাবলীর অন্যতম। অনেক সময় শিক্ষকের গুণে জটিল বিষয়বস্তু সহজ ও সাবলীল হইয়া ওঠে, আবার তাঁহারই অযোগ্যতার ফলে সরল বিষয়বস্তুও কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হয়। শিক্ষকের আত্ম-প্রকাশের শক্তি, ছবি, ছড়া বা অন্য কোন প্রকার কৌশল

অবলম্বন করিয়া বিষয়বস্তুকে সরসভাবে তুলিয়া ধরিবার নৈপুণ্য না থাকিলে ছাত্রগণের মন বিষয় হইতে বিমুখ হইয়া যায়। তাহাদের চিত্তে অনুরাগ জন্মাইয়া না দিতে পারিলে সমস্ত শ্রমই ব্যর্থ হইয়া যায়।

(৪) **সপ্রতিভ দৃষ্টি ও উপস্থিতবুদ্ধি** শিক্ষকের অন্যতম গুণ। ইহার অভাবে শ্রেণীকক্ষে বিশৃঙ্খলা ও অন্যান্য বহুবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। শৃঙ্খলার অভাব ঘটিলে সকল প্রচেষ্টাই অসার্থক হইয়া পড়ে—শ্রেণীকক্ষে একটি গম্ভীর ও স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃজন করিতে না পারিলে শিক্ষকের শত আয়োজন, বিপুল জ্ঞান সবই নিরর্থক হয়। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া ছাত্রচিত্তকে সর্ব্বদাই নিয়োজিত রাখা ও পাঠাভিমুখী করা, গল্প, ছড়া ও অঙ্কনের সাহায্যে বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করা, উত্তম আবৃত্তি, পাঠ ও প্রয়োজনস্থলে নাটকীয় ভঙ্গীর অবতারণা দ্বারা শিক্ষার্থিগণের কৌতূহল জাগাইয়া রাখা শিক্ষকগণের পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(৫) এইজন্য **মধুর কণ্ঠস্বর,** চিত্তাকর্ষক **আবৃত্তি করিবার শক্তি, অঙ্কনে ও রূপায়ণে নৈপুণ্য এবং গল্প বলিবার কৌশল** শিক্ষকের অধিগত থাকিলে শিক্ষাদানকার্য্য সুগম ও সার্থক হয়। শিক্ষকের নাট্যকুশলতা আর একটি অতিরিক্ত গুণ।

(৬) মোটকথা, সমস্ত বিষয়ের সহিত সম্যক্ পরিচয় ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান এবং বাহিরের জগতের সহিত যোগাযোগ ও সাধারণ জ্ঞান শিক্ষকগণের অবশ্য

অর্জ্জনীয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপস্থাপনের পরিপাট্য, রসসৃষ্টিবিষয়ে মৌলিকতা, ছাত্রের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি ও প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি সমান ব্যবহার এবং সহানুভূতিপূর্ণ নির্দ্দেশ সত্যই শিক্ষককে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই উল্লিখিত গুণাবলীর সমন্বয় দুর্লভ হইলেও শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ কাম্য।

শিক্ষকের পরিচালনাকার্য্যে ও শাসন বা শৃঙ্খলাবিধানে যোগ্যতা—

শিক্ষক বিদ্যালয়জীবনের বিভিন্ন অংশে বিভিন্নরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন। শিক্ষাদাতা হিসাবে অনেকে কৃতী বলিয়া পরিগণিত হন কিন্তু তাহাই শিক্ষকের সর্ব্বাঙ্গীন কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। পরিচালক ও শাসনশৃঙ্খলাবিধায়ক হিসাবেও শিক্ষকের দায়িত্ব আছে।

(১) সবার উপরে নিয়মানুবর্ত্তিতা, মার্জ্জিত রুচি, শ্রীলতা ও শালীনতা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য। তাই শিক্ষকগণের এ বিষয়েও যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। আর একটি বিষয়ে শিক্ষককে সচেতন হইতে হইবে।

(২) পরিবেশ সৃজনের দিকেও প্রত্যেক শিক্ষকের লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেক সময় দেখা যায় যে শিক্ষক কেবল শ্রেণীর মুষ্টিমেয় ছাত্রগণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং অন্যান্য ছাত্রগণের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। ইহা শ্রেণীমধ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃজনের পথে বিশেষ অন্তরায়,

তাই যাহাতে শ্রেণীর প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষাকার্য্যে সমভাবে অংশ গ্রহণ করে ও পঠনপাঠনের দিকে মনোযোগী হয় সেজন্য শিক্ষকের বিশেষ যত্ন লওয়া উচিত। এইরূপ অনুকূল ও যথাযথ পরিবেশ- সৃষ্টি শিক্ষকের যোগ্যতার উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে।

(৩) **শিক্ষক যতই পক্ষপাতিত্বহীন, সমদৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হইবেন** শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ ততই উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর হইবে।

(৪) আলস্য, ঔদাসীন্য, যথাযথ আন্তরিকতার অভাব অনেক সময় শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধাকে ক্ষুণ্ণ করে। তাই শিক্ষককে এ বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। কারণ শ্রদ্ধা আকর্ষণের শক্তির সহিত ব্যক্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ব্যক্তিত্বকেই শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা যে পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে শিক্ষকগণের মধ্যে নানা কারণে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অভাব ঘটিয়াছে। দৈন্য, দারিদ্র্য, সমাজের অবজ্ঞা, উত্তম জীবনাদর্শের অভাবও এই ব্যক্তিত্বহ্রাসের সুস্পষ্ট কারণ-রূপে বিবেচিত হইতে পারে, তাই শিক্ষকসমাজের ইহা এক সংকটমুহূর্ত্ত।

(ঘ) বর্ত্তমান সমাজপরিবেশ ও শিক্ষক

কালের আবর্ত্তে সমাজপরিবেশেরও নিত্য নূতন রূপান্তর দেখা দেয়। এই পরিবর্ত্তন রোধ করিবার শক্তি কাহার আছে? পূর্ব্বেকার সেই তরুতলে তপঃক্লিষ্ট আচার্য্যের পদমূলে বিদ্যাশিক্ষা আজ প্রায় স্বপ্নরাজ্যের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাজনীতির তুফান আজ শিক্ষাজগতের দুয়ারে প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজের বিবিধ সমস্যা শিক্ষার্থীর মনোজগতে ছায়া ফেলিয়া যায়। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ"—ইহা আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে বসিয়াছে। বৃহত্তর জীবনের বিপুল সমস্যার দুর্নিবার প্রভাব আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তের ও ভারসাম্যকে পদে পদে ব্যাহত করিতেছে।

এই সংকট-মুহূর্ত্তে শিক্ষকের কর্ত্তব্য কি—ইহাই প্রশ্ন। জাতিগঠনের মহান্ ব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমাজ-চেতনার উন্মেষ-সাধনে তৎপর হওয়া, না পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যাশিক্ষা, ও পুঁথিগত জ্ঞানভাণ্ডারের উদ্‌ঘাটন করা? এই সম্পর্কে শিক্ষকসম্প্রদায়ের বিশেষ চিন্তা করিবার অবসর ঘটিয়াছে।

বৃহত্তর জীবন ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিক্ষাকে যেরূপ দেখা চলে না, সেইরূপ শিক্ষককেও তাঁহার সংকীর্ণ পুঁথির গণ্ডীর ভিতরে বাঁধা বুলি লইয়া সমাজপরিবেশের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিলে চলিবে না। সমাজজীবন ও বৃহত্তর

পরিবেশের সহিত যোগাযোগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে না রাখিলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। তাই শিক্ষার্থিগণকে যথারীতি শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে তাহাদের অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে হইবে এবং তাহাদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন চিন্তাধারাকে উৎসাহিত করিতে হইবে। তবে বিভিন্ন মতবাদকে সুস্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরিয়া শাশ্বত সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দর ও শ্রেয়স্কর আদর্শকে উজ্জ্বলরূপে শিক্ষার্থিচিত্তে প্রতিফলিত করাও শিক্ষকেরই কর্ত্তব্য।

এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। জাতীয়তাবোধ ও মানবপ্রীতির উদ্বোধন করিবার শক্তি প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীকেই সঞ্চয় করিতে হইবে এবং এই বিরাট কার্য্যের সাফল্যের উপরই তাহাদের প্রকৃত কৃতিত্ব নির্ভর করিতেছে। এই শিশু-কিশোরের মধ্য হইতে ভাবীকালের শ্রেষ্ঠ নাগরিক সৃষ্টি করা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য এবং এইখানেই শিক্ষকের যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় ও ইহাই তাঁহার কৃতিত্বের মাপকাঠি।

(ঙ) শিক্ষকের শিক্ষা

শিক্ষকের দায়িত্ব ও যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনার পর একটি প্রশ্ন মনে উদিত হয়। সমস্ত শিক্ষকই কি উক্ত গুণাবলীর অধিকারী? ইহার উত্তরও সুস্পষ্ট। কারণ সমস্ত গুণাবলীর

কোন একটি বিশেষ শিক্ষককে আশ্রয় করিবার সম্ভাবনা অল্প। যদিও একটি প্রবচন আছে যে 'Teachers are born'—তবুও দেখা যায় যে যাঁহারা শিক্ষকের মন ও সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদেরও অনেক কিছু পরিমার্জ্জিত করিবার অবকাশ আছে। আর যাঁহারা জন্মগত সংস্কার ও বৃত্তি হইতে বঞ্চিত তাঁহাদের সম্পর্কে ইহা অধিকতর প্রযোজ্য।

কিন্তু এই সংস্কার বা জন্মগত বৃত্তি লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। কারণ বিরাট শিক্ষাসমস্যার সমাধানকল্পে যে সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন তাহা মিটাইবার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। যাহাতে প্রকৃত শিক্ষক গড়িয়া উঠে, যাহাতে শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ উপদেশ-নির্দ্দেশের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, অবিলম্বেই তাহার ব্যাপক ব্যবস্থা করা বিধেয়। যাহাতে শিশু-মনস্তত্ত্ব উপযুক্তভাবে অধ্যাপিত হয় সেই ব্যবস্থাও এই কেন্দ্রস্থলে প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন।

আর একটি বিষয়ে আজ চিন্তার প্রয়োজন ঘটিয়াছে যে, যাঁহার কোন কিছুই আয়ত্ত নাই—তিনিও কিরূপে শিক্ষকতাকার্য্যে যোগ্যরূপে বিবেচিত হন? অফিসের কেরাণী হইতে স্থরু করিয়া মুদীখানার মুহুরী পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই যেন শিক্ষকতা করিবার অধিকার আছে। শিক্ষকতা যেন এতই সহজ ও গুরুত্বহীন!

চিকিৎসক হইতে স্থরু করিয়া মোটর-চালক পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই তাঁহার নিজস্ব একটি গণ্ডী বাঁধা আছে —সে ক্ষেত্রে অন্য কাহারও অনধিকারচর্চ্চা চলে না—কিন্তু

শিক্ষকতা বা উপশিক্ষকতা যেন সকলের জন্যই উন্মুক্ত। ইহার জন্য কোন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন নাই! ইহা সত্যই বিস্ময়কর ও কৌতুকপ্রদ।

চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে শিক্ষকতাকার্য্যে এই অনধিকারচর্চ্চা তিলে তিলে অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতেছে।

(চ) শিক্ষক—উপশিক্ষক ও অভিভাবক ঃ

পূর্ব্বে শিক্ষার্থীর শিক্ষাবিষয়ক দায়িত্ব প্রধানতঃ শিক্ষক ও অপরদিকে অভিভাবকের উপর নির্ভর করিত। কিন্তু বর্ত্তমান কয়েক বৎসরের মধ্যে অভিভাবকের দায়িত্ব আর এক শ্রেণীর উপসম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই মধ্যস্থ উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টির মূলে আছে অভিভাবকের দায়িত্ব স্খালনের অপচেষ্টা। ইহারা উপশিক্ষক বা গৃহশিক্ষক নামে আখ্যাত।

এই উপশিক্ষণ-প্রথার ফলে যে সব সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(১) শিক্ষার্থীর মনে বিদ্যালয় ও শিক্ষকের প্রতি ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা ইহার জন্য দায়ী। শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষকের উপদেশে মনোনিবেশের প্রয়োজন বোধ করে না—কারণ তাহারা জানে যে গৃহশিক্ষক তাহাদের সমস্ত কিছুই চামচ দিয়া খাওয়াইয়া দিবেন—বিদ্যালয়ের সমস্ত প্রকার কার্য্য নিজেরাই সম্পন্ন করিয়া দিবেন। ইহাতে শিক্ষার্থিগণের চিত্তে ক্রমশঃই ঔদাসীন্য ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব দেখা দেয়।

(২) গৃহশিক্ষার এই আয়োজনের অন্তরালে বহু অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটিয়া থাকে এবং অধিকাংশস্থলেই অযোগ্য ব্যক্তি যোগ্যতার ভাণ করিয়া শিক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষতিসাধন করেন এবং মাসের পর মাস এইরূপভাবে ছাত্রের সহিত গল্পেগুজবে, আলাপ-আলোচনায় অতিবাহিত করিয়া পরীক্ষার পূর্ব্বে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর শিখাইয়া দেন ও তাহা ছাত্রকে দিয়া হজম করাইবারও ব্যবস্থা করিতে তৎপর হন।

(৩) জ্ঞানী পিতার প্রভাব ও তাঁহাদের স্নেহসিঞ্চিত অকৃত্রিম উপদেশলাভের সৌভাগ্য হইতে শিশু-কিশোরগণ বঞ্চিত হয়, ফলে তাহাদের চরিত্রগঠন, আচার-আচরণ ও লৌকিক ব্যবহারে বিশেষ ত্রুটি রহিয়া যায়। বিপরীত ক্রমে অযোগ্য, অর্দ্ধশিক্ষিত আন্তরিকতাহীন উপশিক্ষকদের নিকট হইতে তাহারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বহু অবাঞ্ছিত বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে।

(৪) শিক্ষক ও অভিভাবকগণের মধ্যে যে সহযোগিতা শিক্ষার্থিগণের কল্যাণবিধানে একান্ত অপরিহার্য্য, তাহা এই উপশিক্ষকের অবৈধ উপদ্রবে ক্রমশঃই শিথিল হইয়া যাইতেছে।

(৫) বিদ্যালয়ে দুর্নীতি ও শিক্ষকগণের নৈতিক অধোগতি এই উপশিক্ষকতার আর একটি অবদান। এমন অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আছেন যাঁহারা সূর্য্যোদয় হইতে সুরু করিয়া নিশীথরাত্রি পর্য্যন্ত দ্বার হইতে দ্বারে কড়া নাড়িয়া ছাত্রগণকে মহামূল্য উপদেশ দিয়া অন্নসংস্থান করেন। কেবল বিদ্যালয়ের

সময় কোনমতে উদরপূর্ত্তি করিয়া শ্রান্তদেহে ক্লান্তমনে অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে বিদ্যালয়ে সময় অতিবাহিত করেন। বিদ্যালয় যেন তাঁহাদের নিকট বিশ্রামাগার হইয়া ওঠে।

এইরূপে দিনযাপনের গ্লানিই তাঁহাদের পাথেয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণের নিকট হইতেও অধিকাংশক্ষেত্রে শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিবর্ত্তে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধালাভে শিক্ষকের পরম কাম্যবস্তুকে হারাইতে বসেন। পরিশেষে পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের চেতনা হয় এবং কোনমতে কার্য্যটি বজায় রাখিবার জন্য প্রশ্ন জানিয়া লইয়া, পরীক্ষককে অনুনয়-বিনয় করিয়া এবং সম্ভবস্থলে অন্যান্য কৌশল অবলম্বন করিয়া এই দায় হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস পান।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়

(ক) বিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও বিদ্যালয়ের বিবর্ত্তনের ইতিহাস

সভ্যতার বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে বিদ্যালয়জীবনের সূত্রপাত হইল এবং শিক্ষাধারার অগ্রগতি হইতে লাগিল সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন—কারণ এই বিবর্ত্তনের ইতিহাসের মূলে যে মনস্তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন ছিল তাহার উদ্ঘাটনে বিদ্যানিকেতনের ক্রমপরিণতি ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা সহজসাধ্য হইবে।

প্রথমে মানব যখন সভ্যতার আলোক হইতে বঞ্চিত ছিল, সেই স্মরণাতীত যুগেও শিক্ষার অপরিমার্জ্জিত রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তখন জীবনপ্রবাহ কোন বিশিষ্ট ধারায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তাহাদের অমার্জ্জিত জীবনে তখনও জটিলতা বা অনাবিলতা দেখা দেয় নাই। অতৃপ্ত বুভুক্ষা ও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ছিল প্রবল। তাই বন হইতে বনে, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে, পথে ও প্রান্তরে; হৃদয়ের ক্ষুধা লইয়া সে যুগের অসভ্য মানুষ উন্মাদের ন্যায় ছুটিতে লাগিল—ক্ষুধার তাড়নায় আহার্য্যান্বেষণের প্রবৃত্তি তখন তাহার জীবনে চরমরূপে প্রকট হইয়া উঠিল। জীবনের বন্ধুরপথে বহু প্রতিকূল শক্তির

বিরুদ্ধে সুরু হইল কঠোর সংগ্রাম ও নিরন্তর হানাহানি। ক্রোধের অগ্নি তাহার নয়নে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল ও সংগ্রামের প্রবৃত্তি হৃদয়ে দানা বাঁধিল। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ঘনঘটায় পারিপার্শ্বিক শ্বাপদের গর্জ্জনে তাহার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া দুলিয়া উঠিল। এই ভিত্তির অন্তরালে উঁকি দিল এক দুর্নিবার কৌতূহল ও অজানা রাজ্যের প্রতি আকর্ষণ। চারিদিক যেন তাহার কাছে নিতান্তই অপরিচিত—প্রকৃতি যেন তাহার নিকট একান্ত নির্ম্মম ও উদাসীন।

এইবার সে যাযাবর জীবনের অবসান করিয়া সংঘবদ্ধভাবে ঘর বাঁধিবার স্বপ্ন দেখিল। জীবনের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ও গতি ছিল না। কোনমতে আপনার অস্তিত্বকে বাঁচাইয়া রাখার প্রচেষ্টাই ছিল প্রকট। পশুবধ বা মৃগয়া ও প্রতিকূল পরিবেশের সহিত সংগ্রামেই সে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিত, কোন সম্পূর্ণ সংহত জীবন ও শিক্ষার কোন মহত্তর উদ্দেশ্যের কথা তখন তাহার স্বপ্নের অগোচর ছিল।

সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রয়োজন বাড়িয়া চলিল এবং জীবন-যাত্রায় যেন জটিলতা দেখা দিল। ক্রমশই সে উন্নতধারায় জীবন নির্ব্বাহের জন্য গৃহনির্ম্মাণে, নানারূপ অস্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্র প্রস্তুতিতে তৎপর হইল। কৃষি, মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পে তাহার নৈপুণ্য দেখা দিল ও ক্রমশই তাহার অতীত অভিজ্ঞতা তাহাকে শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিল। পশুপালন,

ও বিভিন্ন শিক্ষার জন্য নিয়মিত ও সুসংবদ্ধ উপদেশ-নির্দ্দেশের প্রয়োজনবোধে সুরু হইল শিক্ষার পরিকল্পনা।

এইরূপে তাহাদের মধ্যে সংহতি ও সামাজিকতাবোধের উন্মেষের জন্য বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হইল। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা রক্ষা করা হইত। সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংবদ্ধ করিবার ইচ্ছাই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। শান্ত-গম্ভীর পরিবেশে প্রবীণদের নিকট হইতে উপদেশ ও বিভিন্ন নির্দ্দেশ, দায়িত্বজ্ঞানের বিকাশ, সমাজচেতনা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উদ্বোধনই এইসব অনুষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রত্যেককেই এই সমস্ত বিধিনিষেধের গণ্ডী মানিয়া লইতে ও কর্ত্তব্য পালনের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করা হইত। দেখা যায় যে এই অনুষ্ঠানসমূহের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানের সূচনা হইল। যাগ-যজ্ঞ, নানারূপ সামাজিক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ একে একে প্রবর্ত্তিত হইল। ফলে এক শ্রেণীর যাজ্ঞিক পুরোহিতের উদ্ভব হইল। তাঁহারাই একাধারে তদানীন্তন সমাজের ধর্ম্মগুরু ও শিক্ষাগুরুর আসন লাভ করিলেন। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে ইঁহাদের নিকট হইতে বিভিন্ন উপদেশ ও শিক্ষা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনকে প্রকট করিতে লাগিল। পুরোহিতগণ সমাজে অশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনেও উপদেষ্টা ও নির্দ্দেশকের আসন লাভ করিলেন।

এইসব যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানের প্রসারের মধ্যেই বিদ্যালয়ের বীজ উপ্ত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যাজ্ঞিক ও ধর্ম্মগত অনুষ্ঠানকে ভিত্তি করিয়া সমাজ-অনুষ্ঠান প্রসার লাভ করিতে লাগিল। পুরোহিতগণের প্রতিপত্তি ও প্রভাব, কি সমাজ জীবনে কি অন্যান্য বিষয়ে তাঁহাদিগকে অধিনায়কের গরিমা অর্পণ করিল। তাঁহারাই লিখিত ও পাঠ্য ভাষাকে সর্ব্বপ্রথমে আয়ত্ত করিয়া সমাজের নিকট বিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও শিক্ষাব্রতী হিসাবে মর্য্যাদা লাভ করিলেন। ক্রমে কর্ম্ম অনুযায়ী জাতিগঠনের পর এই সম্প্রদায়ই শিক্ষক ও উপদেষ্টারূপে নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রথমে যোগ্যতম বলিয়া বিবেচিত হইলেন।

একে একে বিবিধ প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাও গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল।

আদিম সভ্যতার যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত মানবের কৃষ্টিগত অভিযান বিভিন্ন স্তর ভেদ করিয়া ক্রমপরিণতির পথে অগ্রসর হইতেছে। স্মরণাতীত যুগের অসভ্য মানুষ আর বিকট সভ্যতার পূজারী মানুষের মধ্যে কি বিপুল ব্যবধান! কিন্তু এই ব্যবধানের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছে কে?

বিশ্লেষণের ফলে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে শিক্ষার ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় এই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করিয়া আসিতেছে। তাই সভ্যতার সহিত ইহার সম্পর্ক নিবিড়।

তবে এই শিক্ষা ও জ্ঞান পরিবেশনের প্রণালী কত ভাবে কত ধারায় ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে ও করিয়াছে তাহা আলোচনা কব্রার প্রয়োজন।

আজ যে প্রাসাদোপম অট্টালিকা ও সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র লইয়া এই জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্র পল্লীতে পল্লীতে স্থাপিত দেখিতেছি তাহার গোড়াপত্তনের ইতিহাস-আলোচনা সত্যই উপভোগ্য।

পূর্ব্বে গৃহে গৃহে বা প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই প্রবীণগণ তাঁহাদের পুত্র ও কিশোর আত্মীয়বর্গকে বংশগত সংস্কার, কৃষ্টি ও ধারাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদানে অগ্রণী হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহারা ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষাপরিকল্পনার প্রয়োজন যেন বিশেষরূপে অনুভব করিতে লাগিলেন। ফলে গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু তবু কোথাও যেন অভাব রহিয়া গেল। বৃহত্তর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন কতকগুলি কারণে অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

তাই যাহাতে প্রত্যেকেই সমানভাবে ও সমান অধিকার লইয়া একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট গুরু বা শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারে সেইজন্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। অবশ্য বিদ্যালয় বলিতে তখন গৃহ বা অট্টালিকাকেই বুঝাইত না—একটি শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে, একটি সুনির্ব্বাচিত স্থানে এক পবিত্র জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠানকে বুঝাইত। কখনও তরুতলে, কখনও পর্ণকুটীরে এই বিদ্যাদানকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। ইহাই বিদ্যানিকেতনের গোড়ার কথা।

বিশিষ্ট কতকগুলি পরিবারের জন্য এইভাবে উপযুক্ত বিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত হইল এবং ইহাতে আর্থিক সুবিধা ও ভাবের আদানপ্রদানে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হইল। পরে শিক্ষার প্রয়োজন যতই তীব্ররূপে অনুভূত হইতে লাগিল ততই এ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল ও জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তন হইতে লাগিল।

গৃহ হইতে বাহিরে, এই বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠার ফলে দীন, নীচ শ্রেণীও এই শিক্ষালাভের সুযোগলাভ করিল। ক্রমশঃ শিক্ষার্থিজীবনের স্তরবিভেদে, রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যালয়ের প্রকারভেদ দেখা দিল। সেই সুদূর অতীতেও তাই দেখা যায় যে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা শিক্ষা দিবার আয়োজন কি ভাবে—তক্ষশিলা, নালন্দা ও বিক্রমশিলায় চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।

(খ) বিদ্যালয়ের বিবর্ত্তন ও প্রকারভেদ

গৃহশিক্ষানিকেতনেই এই জ্ঞানের শিখা একদিন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং আজ যে শিখায় বিশ্বের গগন উদ্ভাসিত হইতেছে তাহার জন্ম হইয়াছিল পর্ণকুটীরের অন্তরালে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রবীণ ব্যক্তিগণই এই শিক্ষার ভার সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরিবারের শিশুকিশোরের জ্ঞানতৃষ্ণা

সঞ্চার করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। আজও অনেকে গৃহশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী। বিশেষ করিয়া শৈশবে গৃহ-শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

আলোচনাকেন্দ্র ও বিদ্যাবীথি—

বিদ্যাচর্চ্চার উদ্দেশ্যে অনুরূপ কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এক সময়ে ইহার প্রচলন সত্যই বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও সার্থকতা তাই আজও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বিদ্যালয়—

ইহার পর সাধারণ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। অপেক্ষাকৃত ব্যাপক পরিকল্পনায় এই বিদ্যালয় শিক্ষকের পরিচালনায় প্রবর্ত্তিত হইল এবং জীবনের সাধারণ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু তখনও বয়স বা রুচিভেদে শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানলাভের সুযোগ এই সর্ব্বপ্রথম। কিন্তু চিরদিনই আভিজাত্যের অহঙ্কার ও ঐশ্বর্য্যের দম্ভ মানুষে মানুষে ব্যবধান রচনা করিতে চাহে। শিক্ষাক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। তাই এই অভিজাত সম্প্রদায় তাহাদের সন্ততিবর্গের শিক্ষার জন্য এক প্রকার বিশেষ বিদ্যায়তন গড়িয়া তুলিল।

পাব্লিক স্কুল—

ইংলণ্ডে এই বিদ্যালয়ের জন্ম হইল মুখ্যতঃ অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায়। যদিও ইহার নাম হইল Public বা সাধারণ বিদ্যালয় তবুও কেবলমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তান ও আত্মীয়বর্গের উদ্দেশেই উহার সৃষ্টি। সাধারণ, মধ্যবিত্ত শ্রমিকদের নিকট এই বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত ছিল না। আসবাবপত্র, খেলাধূলার ব্যবস্থা ও বিচিত্র আয়োজনের সমারোহ এই বিদ্যালয়ের বিশেষ অঙ্গ ছিল।

আবাসিক বিদ্যালয়—

বিদ্যালয়-গৃহে শিক্ষা-ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবেশ স্থাপনের প্রয়াসের ফলে এই আবাসিক বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। ক্ষেত্রবিশেষে এইরূপ বিদ্যালয়ের উপযোগিতা বিদ্যমান। গৃহে জননী ও অন্যান্য আত্মীয়-আত্মীয়ার যে প্রভাব প্রত্যহই বিশেষরূপে অনুভূত হয়, আবাসিক বিদ্যালয়ে তাহা হইতে শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু অপর দিকে সমাজের কুপ্রভাব হইতে শিক্ষার্থী বহুল পরিমাণে মুক্ত থাকে। এখানে শিক্ষার্থীকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং সহপাঠী ও সহবাসিবৃন্দের সঙ্গ ও সান্নিধ্যই তাহার অবসর-বিনোদনের প্রধান উপায়রূপে বিবেচিত হয়।

ইংলণ্ডে এইরূপ আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রচলন খুব বেশী। ভারতবর্ষেও এই আবাসিক বিদ্যালয় প্রাচীন যুগে প্রচলিত

ছিল। বর্ত্তমানে এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিতান্তই বিরল। কিন্তু বিদ্যালয়ের শাসন ও শৃঙ্খলা ব্যাপারে আজ যে অরাজকতা দেখা দিয়াছে তাহা সমাধানের জন্য অনুরূপ আবাসিক বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। বিশেষ করিয়া যাহাদের গৃহে উপযুক্ত পরিবেশের অভাব তাহাদের পক্ষে আবাসিক বিদ্যালয় একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার্থিজীবনের বিভিন্ন স্তর, প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা অনুযায়ী বিদ্যালয়কে কতকগুলি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই বিভাগ সাধারণের নিকট অতিপরিচিত হইলেও প্রত্যেকটি পর্য্যায়ের তাৎপর্য্য, পৃথক সার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাতের প্রয়োজন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়

গৃহ ও জননীর অংক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই প্রথম শিক্ষার্থিগণ বিদ্যালয়-জীবনে প্রবেশলাভ করে। সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর হইতে সুরু করিয়া ১১।১২ বৎসর পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের অবস্থানকাল নিরূপিত হইয়া থাকে। শিশুর জীবনে বিভিন্ন সংস্কার, প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয় ঘটে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে এবং একে একে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী যথাযথ পরিবেশে স্থাপিত করা হয়। তাই প্রাথমিক শ্রেণীর বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কি পাঠ্যতালিকা নির্ব্বাচনে, কি শিক্ষাপদ্ধতিতে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন।

শিশুর অপরিণত মনকে লইয়া গঠনকেন্দ্রিক কার্য্যের মাধ্যমে তাহাকে পরিণত করিবার দায়িত্বকে মূল্য দেওয়াই স্বাভাবিক। তাই এই সব শ্রেণীতে বিশেষ অভিজ্ঞ, সহানুভূতিশীল ও দরদী শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের বিদ্যালয়সমূহের নিম্নশ্রেণীতে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ-ব্যাপারে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। যথা স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিচ্ছন্নতাবোধ, কর্ম্মকুশলতা। কেবলমাত্র পঠন, লিখন বা গণনাকার্য্যে শিক্ষা দেওয়া কোনমতেই সমীচীন নহে। শিক্ষার্থিচিত্তের উদ্‌ঘাটন, সহযোগিতার আদর্শ সঞ্চার করা ও সামাজিকতার উদ্বোধন মুখ্যতঃ খেলাধূলার মধ্য দিয়াই প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই পর্য্যায়ে যতদূর সম্ভব পুস্তক বর্জ্জন করাই বাঞ্ছনীয় এবং নানারূপ বাস্তব অভিজ্ঞতা, ক্রীড়াকৌতুকের মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

প্রাথমিক স্তরকে 'উচ্চ', 'নিম্ন' এই দুইটি পর্য্যায়ে অনেকে বিভক্ত করেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়—

প্রাথমিক স্তরের পাঠাবসানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের অবকাশ ঘটে। সাধারণতঃ কৈশোরের উন্মেষের পূর্ব্বেই শিক্ষার্থিগণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করে। তাই

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব ও ব্যাপকতার কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। উচ্চ শিক্ষার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুতি-করণের উদ্দেশে এই মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সুনির্দ্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

জীবনের বিভিন্ন দিকে জ্ঞান, অনুরাগ ও ক্রিয়াকুশলতা এমন কি বৃহত্তর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যতালিকা নির্ব্বাচন এই স্তরে একান্ত আবশ্যক। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেতনার উন্মেষ, শরীর সংগঠন ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যবোধকে উদ্দীপিত করিবার উদ্দেশ্যে ইতিহাস, সাহিত্য ও ভূগোলের পঠনপাঠনের যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ বিজ্ঞান ও গণিত প্রভৃতি বিষয়কেও উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীকে দীর্ঘদিন ধরিয়া বিদ্যার্জ্জনে ব্রতী থাকিতে হয়। তাই তাহাদের বয়সের ধর্ম্ম ও স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী বিষয়বস্তুগুলিকে কিভাবে সুসংবদ্ধ বা সুবিন্যস্ত করা যায় তাহাই চিন্তনীয়। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যাহাতে শিশুমনের রূপান্তরের সহিত তাহার পাঠ্য-বিষয়ের যোগাযোগ থাকে এবং তাহার বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার আয়োজন থাকে তাহা বিশেষ লক্ষণীয়। এই স্তরের আবার অন্যান্য দিকও আছে যাহাকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা সঙ্গত নহে। যথা (১) ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষা, (২) বৃত্তি-শিক্ষা ইত্যাদি। পরে স্বতন্ত্রভাবে এগুলির আলোচনা করা হইবে।

উচ্চতর শিক্ষা—

মাধ্যমিক শিক্ষা সুষ্ঠুরূপে শেষ করিবার পর শিক্ষার্থী এই স্তরে উপনীত হয়। এতদিন যাহার প্রস্তুতি ও ভিত্তি গঠন হইয়াছে তাহাকে পূর্ণতর রূপ দিবার এই আয়োজন। এইজন্য বিষয়বস্তুর জটিলতা কমাইয়া, জ্ঞানের গভীরতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এই উচ্চতর শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন। এই স্তরে যাঁহারা উপনীত হন তাঁহাদের ব্যক্তিগত রুচি ও নৈপুণ্যকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করা উচ্চতর শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করা ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠার পথে সহায়তা করাও ইহার উদ্দেশ্য।

(১) সভ্যতা ও সংস্কৃতি,
(২) রাজনীতি ও সমাজতন্ত্র,
(৩) বিজ্ঞান ও গবেষণা,
(৪) সাহিত্য ও সমালোচনা,
(৫) নাগরিকতা ও পরিচালকত্ব (অধিনায়কত্ব),
(৬) ব্যবসা, সাংবাদিকতা, ইত্যাদি

বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশারদ ও উপযোগী করিবার দায়িত্ব উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাতে প্রকৃত জীবনের ক্ষেত্রে এই সব উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পরাজয় না ঘটে, যাহাতে এই স্তর অতিক্রম করিয়া বাস্তবে আসিয়া ইঁহারা যথাযথ অবদান রাখিতে পারেন তাহার প্রতি উদাসীন থাকিলেও চলিবে না। কি সমাজ, কি জাতি,

কি সমগ্র দেশ যাহাতে এই সমস্ত বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে কিছু আশা করিতে পারে সেইরূপ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া এই উচ্চশিক্ষার বুনিয়াদকে যুগোপযোগী পরিকল্পনায় গঠন করিতে হইবে।

এইজন্য বাহির জগতের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, উদার ও সুবিস্তীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যাপক সমস্যার অবতারণা এবং প্রয়োগের সুযোগ-সুবিধার আয়োজন সর্ব্বাধিক, নতুবা কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় পর্য্যবসিত হইলে উচ্চশিক্ষার কোন উদ্দেশ্যই সফল হইবে না।

স্ত্রীশিক্ষা—

আজকাল স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ও প্রয়োজন সম্পর্কে সকলেই সচেতন। তবে আজ যে পদ্ধতিতে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়।

সংসারে স্ত্রীজাতির বিশেষত্ব, তাহার প্রবণতা ও পুরুষের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষাপরিকল্পনা সংহত হইলে তাহা অধিক ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়াই সঙ্গত। আজও যে অনেকে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, বোধ হয় তাহার মূলে আছে ইহাদের জীবনে বিকৃত শিক্ষার প্রতিফলন। সত্যই অনেক সময় দেখা যায় যে দুই পাতা সাহিত্য পড়িয়া দুইটি বীজগণিতের অনুশীলনী করিয়া সংসারক্ষেত্রে ইহাদের

কোন বিশেষ উপযোগিতাই আসে না। তাই বাস্তব উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্যতালিকা ও পরীক্ষাপ্রণালী নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

শিশুশিক্ষাসদন—কিণ্ডারগার্টেন—যাহাতে শিশুগণ স্ফূর্ত্তির সহিত খেলাধূলার মধ্য দিয়া বা উদ্দেশ্যমূলক পাঠের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতে পারে সেইজন্য মহামতি ফ্রয়েবেল্ (Froebel) এই প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। বহিরারোপিত প্রভাব (Impression) এবং অন্তরাগত প্রকাশ (Expression) যাহাতে শিশুর আনন্দময় শিক্ষাজীবনে সংশ্লিষ্টাকারে দেখা দেয়, তাহাই এই প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

মণ্টেসরি পরিকল্পনাও প্রায় অনুরূপ ; তবে এস্থলে ম্যাডাম মণ্টেসরি কাঠের বা অনুরূপ বিভিন্ন প্রকার উপকরণের (যথা, বোতাম, ব্লক ইত্যাদি) সাহায্যে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্মেষিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'হাতে কলমে শিক্ষাই' (Learning by doing) ইহাদের মূল সুর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ের শাসন ও শৃঙ্খলা

(ক) পটভূমিকা ও স্তরভেদ

বিদ্যালয় সম্পর্কে যখনই কোন প্রশ্ন ওঠে তখনই বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার কথাও স্মরণপথে উদিত হয়। সত্যই কি জাতীয় জীবনে, কি বিদ্যালয় জীবনে শৃঙ্খলার বিশেষ প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। এখন শৃঙ্খলা বলিতে কি বুঝায় তাহাই আলোচ্য। পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি আড়ষ্টতা, জড়ভাব ও সঙ্কোচ এবং নিয়ন্ত্রিত গতিবিধিই শৃঙ্খলার প্রধান লক্ষণ। তাই শিক্ষকগণের মধ্যেও এই শৃঙ্খলাচেতনা বস্তুতঃ শিক্ষার স্বাধীন গতিকে শৃঙ্খলিত করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সন্ত্রাসবাদই ছিল তাঁহাদের শৃঙ্খলারক্ষার প্রধান উপায়। শৃঙ্খলাকে শাসন হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা তখনকার দিনে সম্ভবপর হয় নাই। শাসনের দ্বারা ও ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা শিক্ষার্থীর স্বতস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাসকে রুদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে একটি নিষ্প্রাণ নীরবতা ও স্তব্ধ জড়তা সঞ্চার করাই কি তবে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল? যদি তাহাই হয় তবে শৃঙ্খলার প্রকৃত অর্থের সহিত ইহার কতদূর সঙ্গতি আছে তাহাও বিবেচ্য।

ক্রমে ক্রমে শৃঙ্খলা সম্পর্কে ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিল। এই **সন্ত্রাসবাদকে** অনেকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতে সুরু করিলেন এবং পরিবর্ত্তে আদর্শবাদের দ্বারা এই শৃঙ্খলাকে অব্যাহত রাখার আয়োজন চলিতে থাকিল। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, আদর্শ-বাদ ও চারিত্রিক আকর্ষণ দ্বারা বিদ্যালয়ের শাসন-শৃঙ্খলাকে বিশেষরূপে নিয়ন্ত্রিত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল।

শাসনদণ্ডের পরিবর্ত্তে দেখা দিল শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের খরদীপ্তি ও আত্মবিস্তারের দুর্দ্দান্ত প্রয়াস। দেহের বেদনা-বোধকে ভিত্তি করিয়া যে শাসন ও শৃঙ্খলার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃই শিথিল হইয়া আসিল ও শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দিকে তাকাইবার অবসর ঘটিল। ব্যক্তিত্ব-সঞ্চার দ্বারা ইহাদের ভাব-প্রবণ মনে গভীর রেখাপাত করা ও ফলে শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল। কিন্তু কালক্রমে এই **ব্যক্তিত্ববাদেও** ভাঙন ধরিল। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাধারা এই ব্যক্তিত্ববাদকেও মনস্তাত্ত্বিক কারণে পরিণামে ফলপ্রসূ বলিয়া স্বীকার করিয়া লয় নাই। এই যুগান্তরকারী মতবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন পরিকল্পনার নির্দ্দেশ দিল।

মহত্তর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের স্পর্শ যেমন মানবমনের উপর দুর্নিবার প্রভাব বিস্তার করে, সেইরূপ অপরদিকে ইহা দুর্ব্বল ও ক্ষীণসত্তাকে অনেক ক্ষেত্রে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া মধ্যপথে তাহাকে স্বাতন্ত্র্যহীন বা পথভ্রষ্টও করিতে পারে। এই ভিত্তিতে

সন্ত্রাসবাদ ও ব্যক্তিত্ববাদ বিসর্জ্জিত হইল ও সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টি ভঙ্গীতে পরিকল্পিত হইল এক অভিনব মতবাদ। ইংরাজীতে ইহাকে বলা যায় Emancipation বা 'স্ফূর্ত্তিবাদ'। ইহাদের মতে মানুষের, বিশেষ করিয়া শিশুর, স্বাভাবিক প্রবণতাকে রুদ্ধ করা কোনমতেই সমর্থনীয় নহে। ইহাদের স্বতস্ফূর্ত্ত জীবনে আরোপিত নিয়মতান্ত্রিকতা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ম্মম ও নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। সত্যকারের অনুভূতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে শৃঙ্খলাবোধের উদ্বোধন হইবে— ইহাদের মতে তাহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইহার বিভিন্ন দিকও চিন্তনীয়। অনেক ক্ষেত্রে স্ফূর্ত্তি ও প্রবণতাকে বাঁচাইতে গিয়া স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়—এবং তাহা সমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। দ্বিতীয়তঃ যে অভিজ্ঞতা ও স্ফূর্ত্তিকে ভিত্তি করিয়া এই মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুঃখাবহ হইয়া দাঁড়ায়। আপন আপন রুচি অনুযায়ী কার্য্য করিতে গিয়া চপল শিক্ষার্থিগণের চরম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সম্ভাবনা আছে। প্রতিবারই যদি নবলব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্যানুভূতির সঞ্চার করা বাঞ্ছিত হয়—তবে অতীত অভিজ্ঞতা, বংশার্জ্জিত জ্ঞান ও মনীষিবৃন্দের বিধানের কোন মূল্যই থাকে না। ফলে অক্লান্ত সাধনার ফলে যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা আজ মানবের চলার পথে বিশেষ পাথেয়—তাহাকে উপেক্ষা করা আর সভ্যতার অগ্রগতিকে ব্যাহত করা একই কথা হইয়া দাঁড়ায়।

তাই ব্যক্তিত্ববাদ ও স্ফূর্ত্তিবাদের সমন্বয়সাধনই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। অন্যদিকে আত্ম-প্রয়াস ও উদ্দাম গতিবেগকে খর্ব্ব না করিয়া ইহাকে অন্য খাতে বহাইয়া দিতে পারিলে বিদ্যালয়শৃঙ্খলা অটুট অথচ স্বতস্ফূর্ত্ত রূপে বজায় থাকে।

(খ) শৃঙ্খলার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য

মানবজীবনে শৃঙ্খলা সৌন্দর্য্যের পরিপোষক। জীবনকে প্রকৃত ছন্দোময় করিয়া তুলিবার পক্ষে শৃঙ্খলা পরম পাথেয়। কিন্তু শৃঙ্খলার বিকৃত রূপ অনেক ক্ষেত্রে মানবমনে বিভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়, একটি সঙ্কোচ ও শঙ্কার উদ্রেক করে। মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের বীজ উপ্ত করিবার পথে শৃঙ্খলার অবদানকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আত্মনিয়ন্ত্রণের অবকাশ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্ফূরণ ও স্বাধীনতা, প্রকৃত শৃঙ্খলার বিশেষ প্রতীক। যেমন স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার পথে বিশেষ অন্তরায়, আবার ছাত্রগণের মনের স্বাচ্ছন্দ্য হরণ করিয়া বিভীষিকা সঞ্চার করাও তেমনই অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই যেখানে নিয়ন্ত্রণ ও উন্মোচন, তর্জ্জন ও স্নেহপ্রীতি, কঠোর ও কোমল, হিতৈষণা ও শাসনের দ্বৈত প্রভাব বিরাজ করে সেইখানেই প্রকৃত শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা আশা করা যায়। একটি ভারসাম্য এই শৃঙ্খলার অপরিহার্য্য অঙ্গ।

(গ) শৃঙ্খলা ও শাসন

কোনরূপ সঙ্কোচ অনুভব না করিয়া অবাধে চপল শিক্ষার্থী আপনার খেয়ালে বিদ্যালয়জীবন অতিবাহিত করিবে এই দৃষ্টি-ভঙ্গী সম্পূর্ণ রুচিকর ও অভিনব হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে ইহার পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভবপর নহে। তাই শৃঙ্খলার সহিত শাসনের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আজও বিদ্যমান।

অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের স্বকীয় নীতিকে, বৃহত্তর সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এই শাসন অপরিহার্য্য হইয়া ওঠে এবং বিশেষ গর্হিত আচরণকে বেত্রদণ্ডের দ্বারাও রোধ করিতে হয়। তবে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা যত সাবলীল ও শাসন-মুক্ত হইবে সুফলের আশা ততই অধিক।

(ঘ) শাসনের প্রকারভেদ

শাসন বলিতে গেলে যে ধারণার উন্মেষ হয় অনেক সময় তাহা বিভ্রান্ত। কেবল তিরস্কার বা প্রহারের মাধ্যমেই যে এই শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় তাহা নহে, মার্জ্জিত অথচ অধিক কার্য্যকরীভাবে এই শাসনযন্ত্র অন্য প্রকারেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(১) শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা ইহা অনেক সময় শিক্ষার্থিচিত্তে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং অন্যান্য শাসন অপেক্ষা বিশেষ কার্য্যকরী হয়। অবশ্য এই

কার্য্যকারিতা শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণীশক্তির উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

(২) পৃথকীকরণ

অন্যান্য সহপাঠী হইতে দোষীকে পৃথক্ বা 'একঘরে' করিলেও অনেক সময় বিশেষ ফল পাওয়া যায়; উচ্চতর শ্রেণীর বালকের উপর ইহার কার্য্যকারিতা অধিক বলিয়া মনে হয় কারণ সঙ্গলিপ্সার ব্যাঘাত তাহাদের চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে।

(৩) শিক্ষকের অসমর্থন

ইঙ্গিতে, আভাসে, কটাক্ষে ও অন্যান্য উপায়ে দোষীকে অসমর্থন করিলেও অনেক সময় ফল পাওয়া যায়।

(৪) মৌখিক অসমর্থন ও তিরস্কার

গোপনে দোষীকে উপদেশ দিয়া, সহানুভূতিপূর্ণ নির্দ্দেশের দ্বারা দোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ও যথাযথ সতর্কীকরণের দ্বারাও এই শাসনের কার্য্য সম্পন্ন হয়।

(৫) পরীক্ষায় দোষীর নম্বর হ্রাস :—

শ্রেণীতে যেসব পরীক্ষা লওয়া হয় তাহাতে নম্বর হ্রাসের মধ্য দিয়াও দোষীকে শাস্তি দেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই ধরণের শাস্তি বিশেষ বাঞ্ছনীয় নহে।

(৬) **কর্ম্মের অধিকার হইতে বঞ্চিত** করিয়াও শাসনের

কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে। অবশ্য স্থায়ী রূপে এই শাস্তি দেওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।

(৭) **গৃহকার্য্য** বা অতিরিক্ত পাঠ্য ও লেখ্য আরোপ করিয়াও দায়িত্বহীন এবং অনিয়মিত শিক্ষার্থিগণের সংশোধন হইতে পারে।

(৮) **বিদ্যালয়-সময়ের অতিরিক্ত কাল দোষীকে শ্রেণীতে আবদ্ধ রাখাও** এক প্রকার শাস্তি বিশেষ। কিন্তু আবদ্ধ থাকিবার কালে শিক্ষকেরও উপস্থিত থাকা উচিত এবং সেই সময়ে তাহার উপেক্ষিত বিষয়বস্তুকে তাহাকে দিয়া প্রস্তুত করাইয়া লওয়াই ইহার উদ্দেশ্য ; কিন্তু যাহাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন প্রকার বৈরীভাব না জাগে তাহাও লক্ষণীয়। এইরূপ শাস্তির কার্য্যকারিতা সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ আছে।

(৯) **বিদ্যালয়ে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ও ফলে দোষীর অবমাননা**—এইরূপ শাস্তির কার্য্যকারিতা বয়স্ক শিক্ষার্থিদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রবল হয়। যাহাদের আত্মমর্য্যাদা-বোধ যত প্রবল তাহা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা তাহাদের মধ্যে তত অধিক। এইজন্য এই অবমাননা ও লজ্জাকর পরিস্থিতি-সৃষ্টির দ্বারা অনেক সময় বহু প্রকার গুরুদোষেরও সংশোধন হয়।

(১০) **দৈহিক শাস্তি**—বিশেষ গুরুতর অপরাধ ভিন্ন দৈহিক শাস্তি-বিধান না করাই সঙ্গত। বিশেষতঃ—যখন শিক্ষার্থিগণ বয়ঃসন্ধিক্ষণে পদার্পণ করে এবং তাহাদের জীবনে এক সংকট-মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসে তখন এই প্রকার শাস্তিবিধান

বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ; কারণ অনেক ক্ষেত্রে ইহা দোষ সংশোধনে সহায়তা না করিয়া এক অবাঞ্ছিত আচরণের সূচনা করে আর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ককে তিক্ত করিয়া তোলে।

(১১) **জরিমানা**—জরিমানা শিক্ষার্থিচিত্তে কতদূর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাকে তাহার অপরাধ সম্পর্কে কতদূর সচেতন করিয়া তোলে, এবিষয়ে সন্দেহ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা অপরাধীর শাস্তি না হইয়া অপরাধীর অভিভাবকের শাস্তি হইয়া দাঁড়ায়।

(ঙ) শাসনের নীতি ও উদ্দেশ্য

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শাসন বিদ্যালয়ের একটি অবাঞ্ছনীয় অথচ অপরিহার্য্য অঙ্গ। শৃঙ্খলাবিধানই ইহার উদ্দেশ্য। তাই শাসনকে সর্ব্বদাই সংযম ও গুরুত্ব-বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করাই সমীচীন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শাস্তিবিধানে নিম্নোক্ত কতকগুলি দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত :—

(১) অপরাধের গুরুত্ব;
(২) শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা;
(৩) শিক্ষার্থীর বয়স ও প্রবৃত্তি;
(৪) অবস্থা বা পরিস্থিতির তারতম্য অর্থাৎ স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা।

এই বিষয়গুলি স্মৃতিপথে উজ্জ্বল রাখিয়া প্রয়োজন বোধে শাস্তি বিধান করা উচিত। তবে সাধারণতঃ শাস্তিবিধানের সময় শিক্ষক বা শাস্তিদাতা ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়া শাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেন। তাই অনেক সময় লঘুপাপে গুরু দণ্ড হওয়ার ফলে অপরাধীর মনে কোনরূপ অনুতাপ দেখা না দিয়া একটি বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া ওঠে।

শাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য

বিদ্যালয়জীবনে শাস্তিবিধানের সার্থকতা কতদূর তাহা প্রকৃতই চিন্তনীয়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শাস্তিবিধানের মূলে চারিটি উদ্দেশ্য কল্পিত হয়; যথা—রক্ষা, নিবারণ, প্রতিশোধ ও ক্ষতিপূরণ এবং সংশোধন। অপরাধীচিত্তে অনুশোচনার উদ্রেক করিয়া দোষ সংশোধন করা শাসনের একটি উদ্দেশ্য। তাই অনুরূপ উদ্দেশ্য সাধনে শাস্তিবিধানই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। ইহা ব্যতীত শাসনের গৌণ উদ্দেশ্যও বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রগণ এইরূপ অপরাধ করিয়া থাকে যাহা অন্যান্য সহপাঠীদের সম্মুখে কুদৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরে ও বিদ্যালয়ের গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ করে। এইরূপ ক্ষেত্রে উদাহরণ সৃষ্টির জন্য শাস্তির প্রয়োজন। যাহাতে অনুরূপ অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া অন্যান্য শিক্ষার্থী তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় ইহাই এই প্রকার শাস্তির উদ্দেশ্য।

ক্ষতিপূরণ

শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক চাপল্যের ফলে বিদ্যালয়ের আস্‌বাব-পত্র ও সাজসরঞ্জামের ক্ষতি সাধিত হয়। এই ক্ষতিপূরণের জন্য অপরাধীকে বাধ্য করা ও ভাবী উপদ্রব সম্পর্কে সতর্কতা বিধান করাই এই প্রকার শাস্তির উদ্দেশ্য।

মোট কথা, বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন শৃঙ্খলা বিধানই শাসনের চরম লক্ষ্য ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই শৃঙ্খলাকে যেরূপ শাসন ও বিধানের দ্বারা অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করা হয়, সেইরূপ সংগঠন-মূলক কার্য্যের মাধ্যমেও শিক্ষার্থীদের উপর আংশিকভাবে শাসন-শৃঙ্খলার ভার ন্যস্ত করিয়াও উদ্দেশ্য অধিক সহজে সাধিত হয়।

(চ) শৃঙ্খলা ও সংগঠন নীতি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ

স্বাভাবিকভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে শাসন অপেক্ষা সংগঠন-নীতির প্রভাব শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্য্যকরী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের প্রকোষ্ঠে যেরূপ অসহিষ্ণুতা, লঘুচিত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেয় আবার খেলার মাঠে, কোন প্রকার ছাত্র অনুষ্ঠানে ও বিবিধ সংগঠন কার্য্যে ইহারা তেমনই নিয়মনিষ্ঠা ও আজ্ঞানু-

বর্ত্তিতার পরিচয় দেয়। এইরূপ আচরণের মূলে একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায়।

ছাত্রদের উপর দায়িত্ব আরোপ করিলে এবং সংগঠন-মূলক কার্য্যে নিয়োজিত করিলে ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাই এই চাপল্য ও উচ্ছলতাকে একটি খাতে বহাইয়া দিয়া সৃজনাত্মক কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারিলেই সমস্যার সমাধান আশা করা যায়। সৃষ্টির আনন্দ ও ছাত্রদের মধ্যে আত্মমর্য্যাদা-বোধের গৌরবকে বর্ত্তমান শৃঙ্খলাসমস্যার অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিলে সুফলেরই সম্ভাবনা। তাই এই কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা, চাতুর্য্য ও সপ্রতিভতার প্রয়োজন।

মূল কথা, আত্মানুশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে প্রকৃত শৃঙ্খলার আশা করা যায় না।

উল্লিখিত সংগঠনমূলক কার্য্যের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

(১) ক্রীড়া-কৌতুক
(২) বিতর্ক-সভা
(৩) বিদ্যালয় পত্রিকা-সম্পাদনা
(৪) সাহিত্য-সভা
(৫) আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা
(৬) বয়স্কাউট ও গার্লস্ গাইড
(৭) নাট্য-সংঘ

(৮) স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী

ইহা ব্যতীত অন্যান্য অনেক উপায়ও অবলম্বন করা যায় যাহা দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও সুশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা সুগম হইতে পারে।

তাহাদেরই হাতে শাসন ও শৃঙ্খলার ভার নিম্নলিখিত উপায়ে আংশিক ভাবে ন্যস্ত করিলে বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে পারে।

যথা—

(i) শ্রেণী পরিদর্শনের ভার ছাত্রগণের দুই একজনের উপর ন্যস্ত করা ; (e.g. Monitor System, Prefect System)

(ii) কোন বিশিষ্ট শিক্ষকের পরিচালনায় ছাত্রদের উপর পত্রিকা সম্পাদনের ভার অর্পণ করা ;

(iii) শাসন ব্যাপারে ছাত্রগণকেও আংশিক অধিকার দেওয়া ইত্যাদি। (e.g. Students' Tribunal)

(iv) বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বিভিন্নভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ করা (e.g. House System, Bloc System)

আনুক্রমিক আলোচনা অন্য পুস্তকে করিবার ইচ্ছা রহিল।

নবম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পদ্ধতি

বিদ্যালয়-জীবনে পরীক্ষার বিশেষ সার্থকতা কতদূর এবং ইহার উদ্দেশ্য কি তাহাই আলোচ্য।

শাসন ও শৃঙ্খলার পক্ষেও পরীক্ষার একটি প্রভাব আছে সত্য—তবে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জ্জনে অগ্রগতি ও তাহার অন্যান্য শক্তির মাপকাঠি রূপেই পরীক্ষার প্রচলন হইয়াছে।

শিক্ষকগণের আয়োজন ও নির্দ্দেশ এবং শিক্ষার্থীচিত্তে তাহার প্রভাব কতদূর সার্থকতা লাভ করিতেছে—ইহা নির্দ্ধারণ করা পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু শিক্ষার্থীর মনে নৈরাশ্য সঞ্চার না করিয়া তাহাদিগকে অনুকূল প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাও পরীক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(ক) পরীক্ষার উপযোগিতা ও দায়িত্ব

বাস্তব ক্ষেত্রে কঠোর প্রতিযোগিতার ছায়াপাত বিদ্যালয় জীবন হইতেই সুরু হয়—তাই সে স্থলেও নির্ব্বাচন ব্যাপারে এই পরীক্ষাকেই অবলম্বন করা হয়। তাই একদিকে নির্ব্বাচন যেমন পরীক্ষার একটি উদ্দেশ্য, অন্যদিকে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া ছাত্রচিত্তে অনুপ্রেরণার উৎস সঞ্চার করাও ইহার অন্যতম

লক্ষ্য। কিন্তু নির্ব্বাচন ব্যাপারে পরীক্ষার দায়িত্ব ও উপযোগিতা কতদূর তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায় যে বর্ত্তমান যুগেও পরীক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত নৈরাশ্য-জনক।

উন্নততর মানবজীবনে প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ স্থান ও উপযোগিতা আছে এবং প্রত্যেক শিশুর অন্তরেই কিছু কিছু শক্তি নিহিত আছে। তাই, 'কি নাই' তাহা আবিষ্কার করা অপেক্ষা 'কি আছে' তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া সেই শক্তির উন্মেষণেই পরীক্ষার প্রকৃত উপযোগিতা। দ্বিতীয়তঃ—বৃহত্তর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুতিকরণে এবং আত্ম-চেতনা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণে এই পরীক্ষার বিশেষ দায়িত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তাই ইহা বিশেষ ব্যাপক, সর্ব্বগ্রাহী দৃষ্টিভঙ্গীতে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রয়োজন।

(খ) বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ধারা

সাধারণতঃ যে ধারায় আমাদের বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হইয়া আসিতেছে তাহার মধ্যে গতানুগতিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আজও অটুট আছে। ষন্মাসান্তে বা বৎসরান্তে কয়েকটি প্রশ্নবাণ হানিয়া ছাত্রগণের প্রাণশক্তি পরীক্ষায় বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই পরীক্ষার মূল্য কতদূর? শিক্ষায়তনে পরীক্ষার যে যে উদ্দেশ্য, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়-গুলির সন্নিবেশ করার প্রয়োজন।

প্রথমতঃ—বিভিন্ন বিষয়ে আহৃত জ্ঞানকে সুসংহতরূপে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রূপদান করিতে অনুপ্রেরিত করা ও প্রতি বিষয়ে কতদূর ব্যুৎপত্তি বা দৈন্য তাহাও নির্দ্ধারণ করা।

দ্বিতীয়ত ঃ—শিক্ষার্থিজীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে তাহাদের উন্নতি ও অধোগতির পরিমাপ করা ও প্রয়োজন স্থলে শিক্ষকের শিক্ষার্থী সম্পর্কে তাহার ক্রমোন্নতি দেখিয়া মত পরিবর্ত্তন করা।

তৃতীয়তঃ—শিক্ষকের শিক্ষাদানের কার্য্যকারিতা ও ফল নির্দ্ধারণ করা ও প্রয়োজন স্থলে শিক্ষার্থীর সুবিধা-অসুবিধা, দৈন্য ও বীতরাগ বিষয়ে শিক্ষকগণকে সচেতন করা।

চতুর্থতঃ—শিক্ষার্থীর প্রশ্ন সম্পর্কে বিভীষিকা দূর করিয়া তাহাকে যথাযথ উত্তর দানে উপযোগী করিয়া তোলা ও জড়তা, দুর্ব্বলতা হইতে মুক্তি দিয়া—ক্ষেত্র ও সময় বিশেষে সপ্রতিভ করা।

পঞ্চমতঃ—শিক্ষার্থীর প্রয়াস ও শক্তিকে উজ্জীবিত করা।

(গ) পরীক্ষার ত্রুটী ও কুপ্রভাব

যে পরীক্ষার ধারা আমাদের বিদ্যালয়ে অনুসৃত হয়, লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে তাহার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন।

(১) পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নে ত্রুটী,

(২) পরীক্ষকের ঔদাসীন্য ও পক্ষপাতিত্ব,

(৩) মুখস্থ বিদ্যার জন্য কৃতিত্ব দেওয়া,

(৪) মৌলিকতা প্রকাশে সুযোগের অভাব,

(৫) পরীক্ষার মাপকাঠির সংকীর্ণতা,

(৬) প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি উপেক্ষা,

(৭) শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক কার্য্যের প্রতি ঔদাসীন্য—ইত্যাদি বহু ত্রুটী পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে আজও বর্ত্তমান।

ইহা ব্যতীত বিদ্যালয়ের পরীক্ষাকে উদার ও ব্যাপক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে নিয়ন্ত্রিত না করিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবার সম্ভাবনা। পরীক্ষায় সাধারণতঃ বিষয়বস্তুর প্রতি ও স্মরণশক্তির প্রতি এত বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে যে শিক্ষার অন্যান্য দিক—**বুদ্ধির বিকাশ, মৌলিকতার স্ফুরণ, রূপশিল্প** প্রভৃতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবহেলিত হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্যের গরিমা জীবন-পরীক্ষায় ম্লান হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বলিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবার সম্ভাবনা। বাস্তবের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের যেরূপ প্রয়োজন, জীবনের প্রত্যেক দিকে সুস্পষ্ট ধারণা, কল্পনা ও ভাবের বিকাশেরও ততোধিক প্রয়োজন। তাই অনেকেই আজ তথ্যান্বেষী পরীক্ষা (objective manuals) প্রবর্ত্তনের বিশেষ পক্ষপাতী এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গী, রচনানৈপুণ্য ও বস্তুবিন্যাস অপেক্ষা বিবিধ তথ্য ও বিষয়বস্তুর সম্পর্কে জ্ঞান ও

সুস্পষ্ট ধারণা আছে কিনা তাহাই বিশেষরূপে পরীক্ষণীয় বলিয়া মনে করেন এবং তাহাকেই অধিক মূল্য দিয়া থাকেন। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে **তথ্যান্বেষী** পরীক্ষার বিশেষ উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যায় না—তবে মনে হয় রূপায়ণের কৃতিত্ব, বস্তুবিন্যাসের চাতুর্য্য এবং চিন্তাধারার মৌলিকতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয়।

পরীক্ষার কুপ্রভাব

(১) শিক্ষার্থীদের মন হইতে সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ কাড়িয়া লইয়া বর্ত্তমান পরীক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক প্রকার বিভীষিকা সঞ্চার করে ও ফলে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য দিকে অবহেলা দেখা যায়।

(২) বর্ত্তমান পরীক্ষা অনেক সময় লটারী খেলার ন্যায় শিক্ষার্থীর নিকট প্রতিভাত হয়। প্রকৃত জ্ঞান, শ্রম ও নিষ্ঠার নিখুঁত মাপকাঠি হওয়া ত দূরের কথা, অনেক সময় অত্যন্ত স্থূলভাবে পরীক্ষার্থীর স্বরূপ এই পরীক্ষায় ধরা পড়ে—আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, অনুশীলনী ও জ্ঞান চাতুর্য্য ও উপস্থিত-বুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করে—ফলে হতাশা ও নৈরাশ্য দেখা দেয়।

(৩) বর্ত্তমান পরীক্ষা শিক্ষার্থীকে পুঁথিগত বিদ্যার অভিমুখী করিয়া তোলে ও মুখস্থ-বিদ্যার উপর অযথা প্রাধান্য ও কৃতিত্ব আরোপ করে।

(৪) ইহা স্বাভাবিক প্রেরণাকে অনেক সময় রুদ্ধ করিয়া দেয় ও প্রত্যেককেই একই ছাঁচে ঢালিবার প্রয়াস পায়।

(ঘ) ইহার প্রতিকার কোথায়?

শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়নের যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে উপযুক্ত পরীক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে তাহা সার্থক হইবে কি না সন্দেহ। তাই—

(১) শ্রেণীর শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত শ্রেণীকার্য্যের (class work) উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত এবং তাহাদের নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যকেই ক্ষেত্রবিশেষে মাপকাঠি করা চলে।

(২) সমস্যা উপস্থাপিত করিয়া শ্রেণীতেই নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীর সমাধানশক্তি ও মৌলিকতার পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাহাদের মনে প্রকৃত অনুরাগ ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করা যায়।

(৩) বৃহত্তর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরীক্ষা গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

(৪) শিক্ষকই পরীক্ষকের আসন গ্রহণ না করিলে অধিকাংশ সময়ে অবিচারের আশঙ্কা আছে। তাই শিক্ষকের পক্ষেই পরীক্ষা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য বাহিরের একজন পরীক্ষকের সহযোগিতায় এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে।

(৫) প্রশ্ন-প্রণয়নে বিশেষ দক্ষতা ও বহুদর্শিতার প্রয়োজন। যাহাতে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ

করিবার সম্ভাবনা অল্প থাকে সেইজন্য প্রশ্নগুলিকে বিশেষ উপযোগী ও নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে objective testএর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৬) সর্ববিষয়েই গতানুগতিক পরীক্ষা না করিয়া অনুশীলনীয় বিষয়গুলিকে লইয়া ইহা নির্ব্বাহিত করাই বোধ হয় প্রাথমিক স্তরে শ্রেয়ঃ।

(৭) সাধারণ জ্ঞান, শিক্ষার্থীর বাচনভঙ্গী, সপ্রতিভতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় লক্ষ্য করিবার জন্য উচ্চ স্তর পর্য্যন্তও মৌখিক পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

(ঙ) পরীক্ষার পর্য্যায় ও নবরূপ

তাহা হইলে দেখা যায় যে পরীক্ষা-পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ইহাকে চারিটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া প্রবর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃ।

(১) লিখিত পরীক্ষা, (২) মৌখিক, (৩) ক্রিয়া-কেন্দ্রিক পরীক্ষা, (৪) গবেষণাত্মক।

লিখিত পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর লিপি, উপস্থাপন প্রণালী, সৌন্দর্য্যবোধ ও ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই অধঃস্তর হইতেই ইহার উপযোগিতা আছে।

মৌখিক

বর্ত্তমানে মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু এক আধটি বিষয়ে উচ্চ স্তর পর্য্যন্ত মৌখিক পরীক্ষার বিশেষ উপযোগিতা আছে বলিয়া মনে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে লিখিত পরীক্ষা অপেক্ষা মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর মনোভাব, কর্ত্তব্য ও ব্যক্তিগত দৈন্য, সুবিধা ও অসুবিধা, ভালোভাবে ধরা পড়ে। ইহা ছাড়া মৌখিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থী জড়তা ও ভীতি হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হয় এবং তাহার আত্মপ্রত্যয়, বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিবার শক্তি, বাগ্মিধি ও সাধারণ রুচি পরিণতি লাভ করে।

ক্রিয়াকেন্দ্রিক

সাধারণতঃ বর্ত্তমানে একটি বিষয়ে ভারতীয় বিদ্যালয়ে বিশেষ ঔদাসীন্য দেখা যায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর পরিচয় কেবল পুঁথিগত বিদ্যা অনুশীলনীর মধ্যেই নহে—ইহা আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিস্মৃত হই। তাই ক্রিয়াকুশলতা, ক্রীড়াকৌতুক, সংগঠনশক্তি প্রভৃতি নানাদিকে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপের জন্য উক্ত প্রকার পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করার আজ সার্থকতা আছে।

গবেষণাত্মক

প্রাথমিক স্তর হইতেই শিশুর স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহিত করার প্রয়োজন আছে। তাই দুই একটি বিষয় লইয়া গতানুগতিক লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষা দ্বারা পুঁথিগত বিদ্যার

পরিমাপ না করিয়া পরীক্ষা-পদ্ধতিকে স্বতন্ত্রভাবে পরিকল্পিত করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে—প্রকৃতি-বিজ্ঞান পরীক্ষায় জবাফুল বা কচুরিপানা সম্বন্ধে মুখস্থ তথ্য লিখিতে বা বলিতে দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের প্রত্যেককে এক একটি জবাফুল বা অনুরূপ কোন কিছু দিয়া পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা সেগুলির গঠন-প্রণালী ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য লিখিতে বা বলিতে দিলে শিক্ষার্থীর পর্য্যবেক্ষণশক্তি বৃদ্ধি পায় ও ফলে ক্রমশঃ সে পুঁথিগত বিদ্যা অধিগত না করিয়া প্রতিটি বিষয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করে। কেবল প্রকৃতি-বিজ্ঞানেই নহে, যে কোন বিষয়ে, বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান-বিষয়ে অনুরূপ গবেষণাত্মক পরীক্ষা প্রাথমিক স্তর হইতে সুরু করিলে সুফলের আশা করা যায়।

পরীক্ষার নবরূপ—

সাগর পারে বিশেষ করিয়া আমেরিকায় পরীক্ষার নবরূপের পরিকল্পনা চলিতেছে ও এখন হইতেই গতানুগতিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে অভিযান চলিয়াছে। জীর্ণ পুঁথির অন্তরাল হইতে শিক্ষার্থীর মনকে মুক্তি দিবার এই পরিকল্পনা সত্যই আশাপ্রদ। পুঁথিগত বিদ্যা পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকতা-জ্ঞান, সৌন্দর্য্য-বোধ, মানবিক সভ্যতার প্রকাশ হইতেছে কিনা ইহাকেও বোধ হয় পরীক্ষার একটি অঙ্গ করিলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হইতে পারে।

দশম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিগত পার্থক্য

বর্ত্তমান যুগ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। তাই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র বৃত্তিকে উপেক্ষা করা কোন মতেই সমীচীন নহে। শিক্ষাব্যবস্থা জনসাধারণের জন্য উদ্দিষ্ট হইলেও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব সত্তার স্ফুরণের দিকেই ইহার সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিত। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র চিত্তবৃত্তি ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হওয়াই সমীচীন। মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য ও সমতা থাকিলেও তাহাদের মধ্যে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত, চিত্তবৃত্তিগত ও আবেগাত্মক বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। তাই কি শিক্ষাপদ্ধতি, কি পাঠ্যতালিকা, কি শ্রেণী পরিচালনা-কার্য্য, কি অন্যান্য শিক্ষার পরিকল্পনা এইরূপভাবে নির্ব্বাহিত ও নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত যাহা সমষ্টিগত কল্যাণের সঙ্গে শিক্ষার্থি-জীবনের ব্যক্তিগত ত্রুটী ও তৎপরতা, চিত্তবৃত্তি ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য, সঞ্চয় ও অভাব সম্পর্কে বিশেষ সজাগ।

বর্ত্তমানে একের সহিত অপরের পার্থক্য নিরূপণের ভিত্তিতে প্রতিটি ছাত্রের জীবনকে অনুরূপ পথে ও উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে আপন আপন রুচি ও শক্তি অনুযায়ী বিকশিত করিয়া তোলাই শিক্ষার পরম লক্ষ্য

এবং এই কার্য্যে সাফল্যের উপরই তাহার মাপকাঠি নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

সাধারণতঃ কি কি কারণে এই ব্যক্তিগত পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করিতে যাওয়া সহজসাধ্য নহে।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ স্বতন্ত্র উপাদান লইয়া জীবনযাত্রা সুরু করে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তাহাদের এই সহজাত পার্থক্য ভিন্নও বিভিন্ন পরিবেশ ব্যক্তিজীবনকে বিভিন্ন ধারায় ও বিচিত্রভাবে মূর্ত্তি দান করে। তাই (১) সহনশীলতা, (২) মানসিক শক্তি ও ধ্যানধারণা, (৩) সপ্রতিভতা, (৪) বোধ বা উপলব্ধির ক্ষমতা, (৫) আবেগ ও অন্যান্য চিত্তবৃত্তির প্রাবল্য প্রভৃতির দিক হইতে বিচার করিলে মানব-জীবনে শিক্ষার প্রভাব কেন ভিন্ন হয়, কেন একই শিক্ষা-প্রকল্প বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে একই প্রকার পরিণতি দান করে না তাহার কারণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আবার লক্ষ্য করা যায় যে জীবনের বৈচিত্র্যময় পরিবেশের মধ্য দিয়া মানুষের অনুরাগ ও আগ্রহ, লক্ষ্য ও আদর্শ, চরিত্র ও প্রবৃত্তি, কর্ম্মনৈপুণ্য ও তৎপরতা বিভিন্ন হয়।

প্রত্যেকটি জীবনই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হইয়া আপনার নিজস্ব ধারায় ও ব্যক্তিত্বের উপাদানে গড়িয়া ওঠে, বিশ্বপ্রকৃতির ইহাই রীতি।

কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালী রীতির উপর নির্ভর করিয়া মানুষ

কোন দিন নিশ্চিন্ত হয় নাই, হওয়া সঙ্গতও নহে। তাই এই পার্থক্য নিরূপণের জন্য নানারূপ আয়োজন ও উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। সাধারণ হইতে কাহার পার্থক্য ও তারতম্য কতদূরে সর্ব্বপ্রথমে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া সেই তারতম্যের পরিমাপের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। প্রথমে বুদ্ধি বিষয়ে এই পরিমাপের ব্যবস্থার জন্য বহু মনীষীর প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে। অনেকের ধারণা হইতে পারে যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যেই এই তারতম্য বিশেষ প্রকট, কিন্তু একই সমরুচি ও সমচিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই পার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয়—তাই মনে হয় যে "No two persons are alike". এখন দেখা যাউক কি উপায়ে তাঁহারা এই বুদ্ধি পরিমাপের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রথমত একই বয়সের বহু ছাত্র-ছাত্রী লইয়া একটি সাধারণ মাপকাঠি নির্দ্ধারিত করা হয়। সেই সাধারণ মাপকাঠিতে যাহার যেরূপ বুদ্ধি বা ধীশক্তি ধরা পড়ে তদনুপাতে তাহাকে একটি বিশেষ বয়সের পর্য্যায়ে ফেলা হয়, ইহাকে ইংরাজীতে Mental Age বলে। এই মনোগত বয়সকে (Mental Age) তাহার প্রকৃত বয়স দিয়া ভাগ করিয়া লব্ধ I. Q. (মানসিক মান) দ্বারা প্রত্যেকের বুদ্ধির একটি তুলনামূলক পর্য্যবেক্ষণ সম্ভবপর হয় এবং প্রত্যেকের বুদ্ধি সম্পর্কে এক একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়।

কেবল বুদ্ধি বা ধীশক্তির ব্যাপারেই নহে, বর্ত্তমান শিক্ষা-পরিকল্পনা বিভিন্ন বিষয়ে মানুষে মানুষে এই ভেদাভেদ

সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিবার জন্য নিত্যনূতন উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান্ হইতেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা সুদূর অতীতেও প্লেটো প্রভৃতি মনীষিগণ স্বীকার করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন তাই প্লেটোর শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যেও স্থান পাইয়াছিল। গল্টন্ হইতে সুরু করিয়া বহু মনীষীর অক্লান্ত সাধনার ফলে আজ এই ব্যক্তিগত পার্থক্য সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে এবং মেধা, রুচি, শক্তি, সহিষ্ণুতা ও আবেগের স্থৈর্য্য প্রভৃতি বৃত্তির বৈচিত্র্যানুযায়ী শিক্ষা-পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে মেধাবী ও দুর্মেধা প্রত্যেকের জন্য একই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা থাকায় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণ স্ফূরণ কোনরূপে সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই। ফলে প্রত্যেকেই উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইত।

কিন্তু আজ এই বৈচিত্র্য নির্দ্ধারণের মাপকাঠিতে শিক্ষা-পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রিত হইলে প্রত্যেকেরই স্বাধীন সত্তা স্বতঃস্ফুর্ত্ত রূপে বিকাশ লাভ করিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব, রুচি ও শক্তি আপন আপন পথ খুঁজিয়া পাইবে—রুদ্ধ কারার সীমাঘেরা গণ্ডীতে, গতানুগতিক পথের অন্তরালে গুজরাইয়া মরিবে না। আমেরিকায় ও রাশিয়াতে এ বিষয়ে বিশেষ সাফল্য দেখা দিয়াছে এবং স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ

কর্ম্মপন্থাও অনুরূপভাবে অগ্রগতি লাভ করিবে—ইহাই একান্ত কাম্য।

অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিরূপণের সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্নরূপ প্রচেষ্টা ও আয়োজন হইয়া আসিতেছে। বুদ্ধি অনুযায়ী শ্রেণী-উন্নয়নের (Class Promoticn) পরিকল্পনা ও শিক্ষার্থীকে তদনুযায়ী বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া, শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী গোষ্ঠী প্রণয়নের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে অনুরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করা প্রভৃতি নানা প্রকার প্রয়াস দেখা দিয়াছে। তাই ব্যাটাভিয়া পরিকল্পনা হইতে সুরু করিয়া বহু প্রকার শিক্ষা-পদ্ধতির উপায় উদ্ভূত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে উইনেট্কা, ডল্টন্ প্রভৃতি পরিকল্পনাও এই ব্যক্তিগত পার্থক্য সমাধানের এক একটি প্রচেষ্টা বিশেষ।

সেই দিক হইতে ডল্টন পরিকল্পনার বিশেষ সার্থকতাকে অস্বীকার করা যায় না। ইহাতে প্রত্যেক ছাত্রই আপন আপন রুচি, শক্তি ও বুদ্ধি অনুযায়ী কার্য্য ও শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায়। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ইহার প্রচলন বর্ত্তমানে সম্ভব না হইলেও এবং এই পরিকল্পনা একেবারে ত্রুটীমুক্ত না হইলেও ইহা যে আলোচ্য সমস্যার সমাধানে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে ও পথনির্দ্দেশ দিয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই সর্ব্বপ্রকার আয়োজনের ফলে দেখা গিয়াছে যে ব্যক্তিগত পার্থক্য যেরূপ সহনশীলতা, ধীশক্তি, সপ্রতিভতা,

আবেগের প্রাবল্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তি ও দৈহিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, আবার অন্যান্য কতকগুলি কারণকেও এই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের মূলে কার্য্য করিতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে 'সেক্স' (লিঙ্গ), জাতি, বয়ঃপরিণতি, বংশ এবং পরিবেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানুষের নিজস্ব দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য ও উপাদান উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে জটিলতর রূপ পরিগ্রহণ করে এবং ফলে পার্থক্যের উৎস নিরূপণ করা অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ হইয়া ওঠে। তীক্ষ্ণ মননশীলতা, গভীর অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে অনেক সময়ে বিভ্রান্তির অবকাশ ঘটে।

প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই পার্থক্য নিরূপণই উদ্দেশ্য নহে, তদনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা ও সর্ব্বাঙ্গীন আয়োজনের সমাবেশ করিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিণতি দান করাই চরম লক্ষ্য।

এই ব্যক্তিগত পার্থক্যের উল্লিখিত কারণগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত পার্থক্যের হেতু

(১) 'সেক্স' (Sex) বা লিঙ্গ :—

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিক্ষার প্রভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে দেহগত ও বৃত্তিগত পার্থক্যের জন্য পাঠ্যতালিকারও প্রকারভেদের প্রয়োজন। যদিও উভয়ের মধ্যে চিত্ত-সম্পদের দিক হইতে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত

হয় না—তবুও তাহাদের অন্তর্বৃত্তি ও প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ক্রীড়াকৌতুক, গৃহস্থালী-কার্য্যের শিক্ষা, সামাজিক আচরণ ও প্রত্যেকের দেহ ও প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থাই বিধেয় বলিয়া মনে হয়। এতদিন কেবল পুরুষের প্রয়োজনে, তাহার সুখ-সুবিধাকে কেন্দ্র করিয়াই যে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার ধারা আবর্ত্তিত হইতেছিল তাহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। আজও অনেকে স্ত্রীশিক্ষা ও বিশেষ করিয়া সহ-শিক্ষার ঘোর বিরোধী ভাব পোষণ করেন। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে পুরুষের ন্যায় নারীরও সমাজে দায়িত্ব আছে—সেই সামাজিক দায়িত্ব নির্ব্বাহের জন্য তদনুযায়ী শিক্ষার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। সহশিক্ষাও জীবনের বিশেষ বিশেষ স্তরে প্রবর্ত্তন করিলে তাহা সুফলদায়ক হইবারই সম্ভাবনা।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপারে পুরুষগণকে যেমন নারী হইতে অগ্রণী হইতে দেখা যায়, সেইরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ও শক্তিতে (যথা সীবন কার্য্যে) নারী জাতিরই পুরুষ হইতে উৎকর্ষ দেখা যায়। যেখানে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে নারী জাতিই অধিক সাফল্য লাভ করে।

(২) জাতি (Race)—

শিক্ষাকে বিশ্বজনীন সুরে স্পন্দিত করিতে হইলে জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে বাদ দেওয়া চলে না। বিভিন্ন জাতির,

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বিদ্যামন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। আকৃতিগত বৈচিত্র্যের ন্যায় প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্যও তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রকট। তবে একই জাতির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য এত অধিক যে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য ও বিশেষত্বকে লইয়া শিক্ষাবিদের বিব্রত হওয়া নিরর্থক। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এক একটি জাতির এক এক বিষয়ে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, প্রবণতা ও নৈপুণ্য দেখা যায়। তাই যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য উভয়েরই প্রতি সজাগ থাকিলে সুফলের আশা করা যায়।

(৩) বয়স ও পরিণতি (মানসিক ও শারীরিক)—

অন্যান্য কারণ অপেক্ষা মানসিক ও শারীরিক ক্রম-পরিণতি অনুযায়ী (অনুসারে) যে মানুষে মানুষে পার্থক্য বিশেষ প্রকট রূপে লক্ষিত হয় তাহা স্বীকার্য্য। বয়সের সহিত চিত্তবৃত্তির পরিণতির একটি নিয়ত যোগাযোগ বিদ্যমান—তাই শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহাবয়ব ও মনের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। শরীর ও মনের উপর শৈশব ও কৈশোরের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয়। কারণ পরিপুষ্টি, দৃঢ়তা ও সৌষ্ঠব ছাড়া আবেগ ও প্রবণতার দিকেও বয়সের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মানসিক উৎকর্ষ, প্রবৃত্তিগত সমৃদ্ধি, বিভিন্ন পরিমাপের দ্বারা নির্দ্ধারিত করা যায় সত্য কিন্তু বয়সের সহিত প্রত্যেকের যে যোগাযোগ রহিয়াছে তাহার প্রতি উদাসীন থাকিলে চলিবে না।

(৪) বংশ ও পরিবার—

'বংশানুবর্ত্তন' আলোচনা প্রসঙ্গে মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মেণ্ডেল, পিয়ারসন, মর্গ্যান ও অন্যান্য মনীষিবৃন্দ বিশেষ আলোকপাত করিয়াছেন এবং শিক্ষার্থিচিত্তের উপর পরিবার ও বংশের অশেষ প্রভাব সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি শিক্ষার্থিজীবনের উপর বংশানুবর্ত্তনের ন্যায় এক একটি বিশিষ্ট পরিবারের এক এক প্রকার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বংশগত সংস্কার ও ধারা, কৃষ্টি ও অভিজাত্য অনুসারে মানুষের মধ্যে বা শিক্ষার্থীর মধ্যে রুচি, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির পার্থক্য লক্ষিত হয়। তাই শিক্ষাবিদ্‌গণের এই বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার বিশেষ অবকাশ বিদ্যমান।

(৫) পরিবেশ—

শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। পূর্ব্বে যাঁহাদের ধারণা ছিল যে অন্তর্বৃত্তিগুলি আপনা হইতেই আবেষ্টনী অনুসারে বিকশিত হইয়া ওঠে—তাহাদের সেই ধারণা আজ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পরিবেশ জন্ম হইতে জীবনের শেষ লগ্ন পর্য্যন্ত মানবমনে সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে। এমন কি আপন ইচ্ছামত শিশুকে গড়িয়া তুলিবার স্পর্দ্ধাও নাকি

পরিবেশের আছে। এ কথা অনেকাংশে সত্য যে আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে যে বৈচিত্র্য দেখা যাইতেছে তাহা অনেক ক্ষেত্রে মানুষেরই হাতে গড়া।

ইচ্ছানুযায়ী পরিবেশ সৃজনের দ্বারা মানুষ আজ কি না করিতেছে? সাগরপারে মানুষ আজ সত্যই বিশ্বের নিকট বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। দেশনেতা, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক গড়িয়া তুলিবার জন্য, দেশের শিশুকিশোরের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য তাহাদের কি অক্লান্ত সাধনা! অবশ্য পরিবেশ বলিতে সমাজ-পরিবেশ, আবহাওয়া, সংস্কৃতি, গৃহপরিবেশ প্রভৃতি অনেক কিছুই বুঝাইতে পারে এবং ইহারা প্রত্যেকেই জীবনের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আনয়নে বিশেষ কার্য্যকরী। এমন কি শিক্ষক, ধর্ম্ম, শারীরিক বিকৃতি, রোগ, খাদ্য, গ্রন্থ, রীতিনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান, এই পরিবর্ত্তনের মূলে কার্য্য করে। ক্যাটেল (Catell) প্রভৃতি মনীষীর মতে, ঐশ্বর্য্য, সুযোগ, প্রতিষ্ঠান, আদর্শ ও অধিবাসীর উপরও মানুষের ভাবীকালের রূপায়ণ নির্ভর করে ; এবং উপাদানগুলির তারতম্য অনুসারে মানুষে মানুষে পার্থক্য ও ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

মোটকথা, শিক্ষাক্ষেত্রে ও সংস্কৃতির রূপান্তরে পরিবেশের দুর্নিবার প্রভাবকে স্মরণপথে রাখিয়া শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎকে সার্থক করিয়া তোলাই কর্ত্তব্য। বিশেষ বিশেষ শক্তি ও তৎপরতা অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে।

অনেকের মধ্যেই প্রখর ধীশক্তি, কাব্যানুরাগ, গবেষণার প্রতি আসক্তি ও অন্যান্য বহু গুণসম্পদ নিহিত থাকে। কিন্তু এই বিশেষ বিশেষ অনুরাগ ও সুপ্ত শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করিতে না পারিলে ইহাদের বিকাশ হয় না। তাই দেখা যায় যে দুই ব্যক্তির একই প্রকার গুণসম্পদ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও সুযোগ ও পরিবেশের পার্থক্যানুযায়ী পরিণামে তাহাদের মধ্যে বিপুল তারতম্য দেখা যায়। এ বিষয়ে বর্ত্তমান শিক্ষার দায়িত্ব গুরুতর। নিহিত সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য যথাযথ পরিবেশ রচনা—সুযোগ ও সুবিধার ব্যবস্থা করাই বর্ত্তমান শিক্ষার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য।

একাদশ পরিচ্ছেদ

(ক) বর্ত্তমান শিক্ষার ধারা

বিশ্বজগৎ পরিবর্ত্তনশীল। তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাজগতেও আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে।

শিক্ষার সহিত সমাজের ও বৃহত্তর জীবনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে নিবিড় ও কার্য্যকরী করিবার আয়োজন শিশুকে কেন্দ্র করিয়া পরিণতি লাভ করিতেছে।

শিক্ষানিকেতনে শিক্ষকের স্থান ও কার্য্য আজ রূপান্তর পরিগ্রহণ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে শিক্ষকই ছিল শিক্ষায়তনের কেন্দ্রস্থল, কিন্তু বর্ত্তমানে সমস্ত দৃষ্টি শিশু বা শিক্ষার্থীর উপর নিবদ্ধ হইয়াছে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, শিক্ষার্থীর সুখ-সুবিধা, এবং শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া আজ প্রতিটি আয়োজন ও অনুষ্ঠান। পূর্ব্বে শিক্ষকের যে প্রয়োজন ও প্রতাপ বিদ্যমান ছিল আজ তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। শিক্ষকের স্থান আজ প্রায় নেপথ্যে—পরিদর্শন ও পরিচালনাই তাঁহার প্রধান কার্য্য—শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত্তিকে ব্যাহত করিয়া আপনার প্রভাব বিস্তার করা আজ তাঁহার পক্ষে বিশেষ নিন্দনীয়।

সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। কেবল বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষকের জ্ঞানবিতরণ আজ হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। নিশ্চল, নিস্তব্ধ ভাবে শিক্ষকের মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণের পরিবর্ত্তে ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ হওয়াই বর্ত্তমানে বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তির বিকাশ সাধন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সে জন্য পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্ত্তে বাস্তবের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মাধ্যমে ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন সত্যই সার্থক। সংস্কৃতি, শিক্ষা, সভ্যতা ও ধ্যানধারণার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি-শিক্ষা পরিচালনের প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষ রূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। জীবনের সংগ্রামে শিক্ষার্থীকে যোগ্যতর করিয়া তোলাও বর্ত্তমান শিক্ষার দায়িত্ব।

তাই সমষ্টিগত ভাবে অধ্যাপনা অপেক্ষা মানসিক উৎকর্ষ ও সম্পদ অনুযায়ী ব্যক্তিগত শিক্ষাদান বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। শ্রেণীর মধ্যে সাধারণভাবে শিক্ষা না দিয়া যতদূর সম্ভব শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সুখসুবিধা, অভাব ও দৈন্যের প্রতি দৃষ্টি না দিলে অবিচারের সম্ভাবনা। তাই শ্রেণী গঠনেও বিশেষ পারদর্শিতার প্রয়োজন। অনুরূপ বুদ্ধি ও চিত্তোৎকর্ষসম্পন্ন শিক্ষার্থী লইয়া শ্রেণী গঠিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন।

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা সম্পর্কেও আজ যুগান্তরের সূচনা

হইতেছে। নির্ম্মম অনুশাসন এবং কঠোর শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রবণতা, স্বাচ্ছন্দ্যকে অটুট রাখিয়া কিভাবে বিদ্যামন্দিরকে লীলানিকেতনের প্রতিচ্ছবি রূপে গড়িয়া তোলা যায় তাহার প্রচেষ্টা আজ দিকে দিকে দেখা দিতেছে।

পাঠ্যতালিকা শিক্ষাযন্ত্রের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তাই শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যতালিকায়ও বিপুল পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে।

পাঠ্যতালিকার মাধ্যমে সমাজচেতনা ও জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন আজ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই কি সাহিত্যে, কি ইতিহাসে অনুরূপ বিষয়বস্তু বিন্যাসের প্রয়োজন (বিস্তারিত আলোচনা পাঠ্যতালিকার মধ্যে দ্রষ্টব্য)।

পাঠ্যতালিকার মধ্যে সংহতি স্থাপন বর্ত্তমান শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্বে প্রত্যেকটি বিষয়কে পৃথক ভাবে কল্পনা করা হইত ও অনুরূপ পদ্ধতিতে শিক্ষা ও শিক্ষণব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন দিক বিবেচনা করিয়া সামগ্রিক দৃষ্টিতে পাঠ্যতালিকা নির্দ্ধারিত হইতেছে। জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যতই প্রয়োজন বাড়িয়া চলিয়াছে ততই জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রবর্ত্তন হইতেছে। ইহাদের প্রত্যেকের সহিত জীবনের যে অলক্ষ্য যোগাযোগ বিদ্যমান তাহা চিন্তা করিলে বিষয়বস্তুগুলিকে পৃথকরূপে পরিকল্পিত করিয়া শিক্ষা দেওয়ার

কোন সার্থকতা থাকে না। তাই ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়া অনেকে সমস্ত প্রকার বিষয়বস্তুর শিক্ষাপরিকল্পনাকে সমর্থন করেন। যাঁহারা ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানই বিষয়বস্তু-বিন্যাসের কেন্দ্র হওয়া উচিত। সত্যই এইরূপ পাঠ্যতালিকার পরিকল্পনা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া তুলিবে।

আর একটি বিশেষ দিকে আজ লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; বিষয়বস্তুর বহিরাবরণের দিক হইতে তাহার মর্ম্মোদ্ধারের প্রতি চেতনার উন্মেষ হইয়াছে এবং উদ্দেশ্যমূলক ভাবে তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতির দিকেও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। ব্যাকরণে আজ আর সূত্র মুখস্থ রাখার বিশেষ প্রয়োজন স্বীকৃত হয় না; ভাষা ও সাহিত্যে ব্যাকরণের প্রভাব ও অনুশাসন কতদূর তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাই বর্ত্তমানে ভাষার ও সাহিত্যের মাধ্যমে অবরোহণ-পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষার কথা উঠিয়াছে। বিজ্ঞান বিষয়েও একই কথা চলে। (বিস্তারিত আলোচনা এই পুস্তকের পাঠ্যতালিকা পর্য্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

নৈতিক শিক্ষা ও অবসর বিনোদন

(ক) **নৈতিক শিক্ষা**—নব নব শিক্ষাপরিকল্পনার মধ্যে নৈতিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনেরও প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে। ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে—ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠনে সহায়তা করে কিন্তু নীতি মানুষকে উদার বিশ্বজনীন দৃষ্টি

হইতে বঞ্চিত করে না—তাই আজিকার হানাহানি ও অশান্তির রাজ্যে নীতিশিক্ষার প্রয়োজন সত্যই অনুভবযোগ্য। সংস্কৃতি ও শিক্ষার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যও নীতি-শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন—নতুবা পারস্পরিক বিদ্বেষ ও হিংসার লেলিহান শিখায় সব কিছুই বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

(খ) **অবসর বিনোদন**—এতদিন এ বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। অবশ্য জীবনে অখণ্ড অবসর মিলিবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। তবু কর্ম্মজীবনের অবসানে বা বিদ্যালয়ের বাহিরে যে অবসর মিলে তাহা কিরূপে ব্যয়িত করা যায় বা ব্যয়িত করা সার্থক তাহা চিন্তা করিবার অবসর উপস্থিত। সুখময় অথচ কল্যাণকর কি উপায়ে জীবনের এই খণ্ড খণ্ড অবসরগুলিকে সার্থক ও মধুময় করিয়া তোলা যায় সেই সম্পর্কে বহু মনীষীর চিন্তাস্রোত অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রকে অধিক উর্ব্বর ও ফলপ্রসূ করিয়া তুলিবে বলিয়া বিশ্বাস।

বিবিধ শিক্ষা-সমস্যা ও পরিকল্পনা

(ক) **বয়স্কদের শিক্ষা**—প্রত্যেক দেশেই বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে বয়স্কদের শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করিয়া সমাজে ইহাঁদিগকে অধিক উপযোগী করিয়া তোলা রাষ্ট্রের ও সর্ব্বসাধারণের দায়িত্ব। কিন্তু নানা ভাবে এই নিরক্ষর বা অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাই ইহাদের জন্য **নৈশ বিদ্যালয়ের** প্রবর্ত্তনে

সমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে। এইজন্য বাস্তব জীবনের সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখিয়া ইহাদের পাঠ্যতালিকা ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হইল।)

বিকৃতাঙ্গ ও চিত্তবৈকল্য

বিধাতার সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়। তাই প্রত্যেকের বুদ্ধিও যেমন সমান নহে, অনেকের মধ্যে আবার অঙ্গবিকৃতিও নানা প্রকারে দেখা দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে যে অভিশাপ ইহাদের জীবনে আসিয়া পড়ে তাহার জন্য অনেক ক্ষেত্রে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই সম্ভবপর হয় না। তাই সমাজের এই অভিশাপ মোচনের জন্য অন্যান্য দেশে আজ যে প্রয়াস দেখা দিয়াছে তাহার প্রসারকল্পে প্রত্যেকেরই আন্তরিক সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়।

স্বাভাবিক চিত্তদৌর্ব্বল্য, ক্ষীণমেধা ও দিবাস্বপ্ন প্রভৃতি এক একটি রোগ বিশেষ। তাই ইহাদের চিকিৎসা ও উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য ভাবী সমাজকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই স্বাধীন জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনার সার্থকতা।

বুদ্ধি, শক্তি, রুচি প্রভৃতির পরিমাপ উদ্ভাবন ও তাহার উপযোগিতা

সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে নানা রুচি, বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তি, বিবিধ শক্তি ও মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে

প্রত্যেকটিরই বিশেষ বিশেষ মূল্য আছে। যাহার মধ্যে যাহা সুপ্ত আছে তাহা আবিষ্কার করিয়া উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিলেই সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। তাই বর্ত্তমানে এই প্রবণতা, রুচি, এমন কি মনোবৃত্তি ও বুদ্ধি পরিমাপ করিবার জন্য নানা উদ্ভাবন সুরু হইয়াছে। ইহা আধুনিক শিক্ষাধারার একটি বিশেষ গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সমাজের সহিত শিক্ষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটির অভাবে আর একটি অসার্থক। শিক্ষা-পরিকল্পনা তাই বৃহত্তর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবিত হওয়াই সমীচীন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে আজ যে বিশ্বের আকাশে দুর্য্যোগের ঘনঘটা তাহার মূলে দেখা যায় এই সমাজচেতনার অভাব। তাই অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে প্রথমত একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া ওঠার প্রয়োজন। অভিভাবক-দিবস ও শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরস্পর ভাববিনিময় না ঘটিলে শিক্ষার পরিধি ক্রমশঃই সংকীর্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

রাজনীতি শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তরায় সূচনা করে সত্য কিন্তু সামাজিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়ত ভাবী-জীবনের সহায়ক। তাই উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে দেশের

সমাজের সহিত কি শিক্ষার, কি শিক্ষাপদ্ধতির যোগাযোগ থাকা আবশ্যক এবং এই সামাজিকতা বা নাগরিকতা শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন। মোট কথা, শিক্ষা পরিকল্পনা সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের বাণীবাহী না হইলে বিশ্বের কোন সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবপর নহে।

(খ) যুগের সঙ্কট ও শিক্ষা

বর্ত্তমান যুগ এক সংকটময় যুগ। কত সমস্যা যে কতভাবে আজ মানবের জীবনে দেখা দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জীবন-যাত্রা যেন ক্রমশই জটিল হইয়া উঠিতেছে। বৃহত্তর জগতের ন্যায় শিক্ষাজগতেও আজ এক বিপুল আলোড়ন! সত্যই কয়েকটি দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে এই আশঙ্কা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।

বর্ত্তমান শিক্ষিত মানুষ যেন মানব-প্রীতি হারাইয়া ফেলিয়া অসহিষ্ণু, অসংযত ও কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। পথে ও প্রান্তরে সর্ব্বদাই দেখি এক প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতা মানুষের মুখে-চোখে ফুটিয়া ওঠে—যেন আঘাত হানিবার একটি দুর্ব্বার নেশায় সে মাতিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেন এই স্থৈর্য্যের অভাব, সহিষ্ণুতার কার্পণ্য, প্রশান্তির দৈন্য?

এই সব সমস্যার সমাধানে শিক্ষার কি কোন দায়িত্বই নাই? এই যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত মানবজীবনকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে, আমার মনে হয় তাহার মূলে আছে মানব-প্রীতির

অভাব ও নিরাপত্তাবোধের শৈথিল্য। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা ও হাহাকার যেন সময়ে অসময়ে স্থানে অস্থানে ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছে। তাই আজ দিকে দিকে এই প্রচণ্ড বিক্ষোভ—এই দারুণ আত্মবিকৃতি ও আত্মবিস্মৃতি। আজ দেখি, দুর্ব্বলকে নিষ্পেষণের জন্য প্রবলের কি দুরন্ত উন্মাদনা! এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয় যে মানবের সমান অধিকার এবং মানবত্বের দাবী আজ সমাজদেহকে বিশেষরূপে আন্দোলিত করিয়া শিক্ষাজগতেও তরঙ্গ তুলিতেছে। ফলে অতীতের সেই শ্রেণীশিক্ষার আয়োজন আজ ধ্বসিয়া পড়িতেছে এবং পরিবর্ত্তে দেখা দিতেছে সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্বপ্রকারের মানুষের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন। স্ত্রী, পুরুষ, ধনিক, শ্রমিক, নির্ব্বোধ, বুদ্ধিমান ও এমন কি মূক, বধির, অন্ধ প্রত্যেক মানবেরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আজ সমান বলিয়া স্বীকৃত। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও ইহাদের দাবীকে উপেক্ষা করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আজও যে অজ্ঞানের অন্ধকার বিরাজ করিতেছে তাহাকে অপনীত করিয়া জ্ঞানালোকের প্লাবন আনয়ন করিবার দাবীই এ যুগের দাবী। তাই পুরাতন পুঁথিগত শ্রেণীশিক্ষার পালা শেষ করিয়া দিয়া আজ এক নূতন শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন। যে শিক্ষা মানুষকে আনিয়া দিবে অমৃতের আস্বাদন, নূতন দৃষ্টি, পরিপূর্ণতা ও মুক্তির অভয়-মন্ত্র, সেই শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন আজ কোথায়?

এই জাগরণের জোয়ার আনিতে গেলে চাই বর্ত্তমান সমস্যাগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি। কারণ বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া কেবল উচ্চতর আদর্শে শিক্ষাযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিলে তাহা হইতে সুফলের আশা কম। সমস্যাগুলির মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে অর্থনৈতিক সমস্যা। অনেকেরই জীবনে দেখা যায় যে শিক্ষা ও সাধারণ পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট আহরণ করা সত্ত্বেও তাঁহাদের জীবন বিড়ম্বনাময়। মনে হয় বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও যদি অন্নসংস্থানের জন্য এত কষ্ট সহ্য করিতে হয় তবে শিক্ষার মূল্য কোথায়? তাই অর্থকরী বিদ্যার প্রয়োজন আজ বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা আজ বিশেষভাবে শিক্ষাজগতের দুয়ারে প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে। বাহির-বিশ্বে যে তীব্র হানাহানি, সারা পৃথিবীর আকাশে যে দুর্যোগের ঘনঘটা, শিক্ষাজগতেও তাহার প্রতিফলনকে অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক সমস্যা আজ প্রত্যেক দেশের উপরেই দুর্য্যোগের ছায়া ফেলিয়া যাইতেছে।

রাজনীতির নামে আজ প্রবলের উদ্ধত অন্যায় ও নীচতা, স্বার্থান্ধতা ও নির্ম্মম পেষণের প্রবৃত্তি অবলীলাক্রমে মানবত্বকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। সেখানে মানুষের সমস্ত মানবিকতা, মমত্ববোধ ও উদারতার যেন নির্লজ্জ বিসর্জ্জন ঘটিয়াছে। নৈতিক আদর্শ আজ বিশেষভাবে বিপন্ন। সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমের বুকে এই দানবের রুদ্রলীলা মানবহৃদয়ের

অমূল্য সম্পদকে, ত্যাগ ও ক্ষমার আদর্শকে বিদ্রূপ জানাইতেছে।

আর একটি প্রশ্ন আজ অনেকের মর্ম্মমূলকে আলোড়িত করে। প্রাচীন আদর্শের সহিত যুগ-আদর্শের যেন এক বিপুল সংঘাত বাধিয়াছে। চেতন-লোক ছাড়িয়া, ভাবসম্পদকে উপেক্ষা করিয়া আজ মানুষ জড়জগতের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছে। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের জন্য তাহার এই অভিযান নহে—তাহাকে অগ্রাহ্য করিবার মধ্যেই যেন তাহার আনন্দ। প্রকৃতির প্রতি মানুষের এই বিদ্রূপ হয়ত নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূচনা করিতেছে, অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু প্রকৃতিজগতের প্রতি এই বিদ্রূপ তাহার নিজেরই প্রতি বিদ্রূপ কি না কে জানে? মনে হয় যে বিজ্ঞান মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে জন্ম লইয়াছিল, আজ তাহা পিঞ্জরমুক্ত হইয়া মানুষেরই ধ্বংস ডাকিয়া আনিতেছে। আজ মনে পড়ে সেই উপাখ্যানের কথা—সেই মুনি আর মূষিকের কথা—যে মূষিক মুনিরই অনুগ্রহে সিংহত্ব প্রাপ্ত হইয়া মুনিকেই গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

আমাদেরই হাতে-গড়া সমাজ ও সভ্যতা যেন জীবনে এক পঙ্কিলতা ও গ্লানিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু কেন? এই বিপর্য্যয়ের জন্য দায়ী কে? মনে হয় মানুষ নিজেই মূলতঃ ইহার জন্য দায়ী। ইহার জন্য দায়ী তাহার শিক্ষাসংস্কৃতি

ও আত্মবিশ্লেষণে বিভ্রম। চারিদিকে যে ঘোর অবিশ্বাস ও সংঘাত দেখা দিয়াছে তাহা কি জাতীয় জীবনে, কি সমাজ-জীবনে, কি শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িতেছে বলিলে ভুল হয় না। আমরা আজ ঘোরতর সমস্যার সম্মুখীন। মানুষ যাহা চাহিয়াছিল তাহা পায় নাই—তাই সেই পাওয়ার নেশায় তাহার ঘরছাড়া মন যেন অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল কুড়াইয়াই তাহার আহরণের প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতেছে। কিন্তু আর নয়! এইবার তাহার ফিরিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এতদিন দুরন্ত উন্মাদনায় যে পথে সে ছুটিয়া চলিয়াছিল; বুকে কামনার জ্বলন্ত শিখা লইয়া যে অভিযান স্থরু করিয়াছিল, সে যে অগ্নিশিখার উদ্দেশ্যে পতঙ্গের অভিযান! কিন্তু মরণের অভিসারে যে যাত্রা সে স্থরু করিয়াছে তাহার কি কোন মূল্যই নাই? মনে হয় ইহারও একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। তাহার এই দুরন্ত অভিযান এই পরিচয়ই দেয় যে মানুষ চিরদিনই নূতন আলোকের জন্য আকুল। এই অভিযান কোনদিনই ঘৃণ্য নহে। তাই যদি সে প্রকৃতিস্থ হইয়া আপনার প্রকৃত কল্যাণ-কামনায় যত্নবান হয়, যদি মানুষে মানুষে ব্যবধান ঘুচাইয়া প্রীতি ও প্রশান্তির প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পায় তবে একদিন মানুষের পৃথিবীতে আবার সুখশান্তি নামিয়া আসিবে।

এখন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যে যে সমস্যা প্রগতির অনিবার্য্য প্রতিফলনরূপে দেখা দিয়াছে, তাহাদের স্বরূপ কি এবং তাহাদের

সমাধানেরই বা কতদূর প্রয়াস দেখা দিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ—বাস্তব ও আদর্শ জগতের মধ্যে একটি সুখময় সমন্বয়-সাধনের প্রতি শিক্ষার ঔদাসীন্য।

দ্বিতীয়তঃ—একদিকে উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও অপর দিকে পূর্ণ সমাজচেতনা—উভয়ের মধ্যে একটি বোঝাপড়ার প্রয়োজন-বিষয়ে শিক্ষার সজাগ দৃষ্টির অভাব।

তৃতীয়তঃ—দরিদ্র, অসহায়, হীনবুদ্ধি, বিকলেন্দ্রিয় হইতে সুরু করিয়া প্রত্যেকের শিক্ষাব্যবস্থা-বিষয়ে অতৎপরতা।

চতুর্থতঃ—অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে কার্য্যকরী শিক্ষা ও অন্যান্য উপায় অবলম্বনে বিলম্ব।

পঞ্চমতঃ—দেশের যুবশক্তির শোচনীয় অপচয় ও বিকৃত রূপ।

ষষ্ঠতঃ—শিক্ষকের দুর্গতি ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বনে শৈথিল্য।

আর একটি সমস্যা আজ প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে একটি প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও শাসন-শৃঙ্খলা অমান্য করিবার চেষ্টা আজ যেন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে দূরে সরাইয়া দিতেছে। ফলে শিক্ষক বা অধ্যাপক-বর্গ যেমন ছাত্রগণের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপাইবার চেষ্টা করেন, অন্য দিকে ছাত্রগণও শিক্ষক, শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থার উপর ঘোর অসন্তোষ প্রকাশ করে। কিন্তু উভয় পক্ষের এই অসহযোগিতার পরিণতি কোথায় চিন্তা করিলে মন

গভীর নৈরাশ্যে ভরিয়া ওঠে। মনে হয় যে এই সমস্যা আজিকার শিক্ষাবিদ্গণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলে শিক্ষাজগতে এক বিপর্য্যয় ঘনাইয়া আসিবে।

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে পারস্পরিক অসন্তোষ প্রকাশ বা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে কয়েকটি বিষয় ভাবিয়া দেখিবার অবসর আছে।

প্রথমতঃ—পূর্ব্বে কেন এই সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে নাই ?

দ্বিতীয়তঃ—আজ দুনিয়ার সর্ব্বত্র যে হানাহানি, যে অরাজকতা চলিতেছে তাহা কি ছাত্রচিত্তের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করে না ?

তৃতীয়তঃ—আমাদের পাঠ্যতালিকা, শিক্ষাব্যবস্থা কি এই চলচপল ছাত্রগণের মনে যুগোপযোগী পাথেয় পরিবেশন করিয়া তাহাদের জ্ঞানলাভের প্রতি অনুরাগকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছে ?

মূলতঃ যে অর্থনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যার সহিত বিপুল পক্ষবিস্তার করিয়া মানবের প্রকৃতিস্থতা ও আত্মপ্রসাদকে আচ্ছন্ন করিতে চাহিতেছে তাহার সমাধান করা যায় কিনা ?

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্প্রতি ছাত্রগণের নিকট হইতে যে মান ও উৎকর্ষ আশা করিতেছেন তদনুযায়ী অধ্যাপনার ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে এই অসন্তোষ ক্রমশই নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিবে।

কারণ প্রথমতঃ বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায় কিনা এবিষয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে—দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই এক একটি নাট্যশালার রূপ গ্রহণ করিয়াছে; ছাত্রসংখ্যা অধিক হওয়ার ফলে ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত কারণে সেখানে ছাত্রগণের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দিবার সুযোগ হয় না।

তাই মনে হয়, পরীক্ষার মানোন্নয়নের পূর্ব্বে অনুকূল শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। নতুবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অর্থনৈতিক সংকটের দিনে ছাত্রগণ অপেক্ষা ছাত্রগণের অভিভাবকগণই তাহাদের পুত্রপৌত্রের বিফলতার জন্য গুরুদণ্ড বহন করিবেন এবং ছাত্রগণের সমষ্টিগত অসাফল্যে তাহাদের মনের সংকোচ ক্রমশঃ অপনীত হইবে; ফলে ইহাতে অধিকতর অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে।

মোটামুটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যে সমস্যা আজ জাতীয় জীবনে ও শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে তাহাদিগকে মূলতঃ নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা চলে ঃ—

(১) সমাজ-সমস্যা ;
(২) অর্থনৈতিক সমস্যা ;
(৩) শিক্ষা-সমস্যা ;
(৪) নৈতিক সমস্যা।

এই সমস্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের বিপুল প্রয়াস দেখা না দিলেও মাঝে মাঝে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের পরিকল্পনা

সমস্যার আংশিক সমাধানের পথ খুঁজিয়াছে। এই পরিকল্পনা-গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাজগতে গান্ধিজীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনা এক যুগান্তর আনিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গান্ধীজির অন্তর্দৃষ্টির নিকট ভারতীয় শিক্ষার সমস্ত প্রকার ত্রুটী ও বিচ্যুতি বিশেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। তাই ভারতীয় পরিবেশে তাহার যথাসম্ভব সংস্কারের জন্য গান্ধীজীর অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। ব্রিটিশের দেওয়া কৃত্রিম শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁহার এই অভিযান সত্যই প্রশংসনীয়।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে এই পরিকল্পনার মূল সুর যেন মানবত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত। মানব-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশই ইহার চরম লক্ষ্য।

এখন দেখা যাউক কি ভাবে এই পরিকল্পনা সমস্যার বিভিন্ন দিকের প্রতি সচেতন।

প্রথমতঃ, দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা তাঁহার বাস্তববাদী অভিজ্ঞ মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাই তিনি কেবল অধ্যয়ন ও অনুশীলনের সঙ্গে 'হাতের কাজের' একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার মধ্যে নানা প্রকার হাতের কাজ (আসবাব নির্ম্মাণ, পুতুল ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু তৈয়ারী করা) কৃষিকার্য্য, ছাত্রদের দেহ ও

মনকে একত্র বলিষ্ঠ ও সতেজ করিয়া তুলিবে ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের ব্যয়সংকুলন ও আর্থিক সমস্যার সমাধানও ইহার দ্বারা আংশিকভাবে সম্ভবপর।

দ্বিতীয়তঃ,—শিশু-কিশোরকে বৃহত্তর সমাজের উপযোগী করিবার জন্য গান্ধীজীর একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এই পরিকল্পনার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তাই গতানুগতিক পাঠ্যসূচী হইতে আলোচ্য পাঠ্যতালিকা কত বিভিন্ন। যাহাতে সহযোগিতা ও স্বাবলম্বনের মধ্য দিয়া পারিপার্শ্বিক জীবনের সহিত প্রত্যেক শিশু-কিশোর নিবিড়ভাবে পরিচিত হইতে পারে এবং বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তুলিতে পারে সে দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ও নির্দ্দেশ ছিল। তাই সংঘাত-বিধ্বস্ত জগতে প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে সহযোগিতার আদর্শ সঞ্চার করিতে ও প্রাণে সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগাইয়া তুলিবার মানসে তাঁহার আয়োজনের অন্ত ছিল না।

কেবল ইহাই নহে, গান্ধীজির শিক্ষা জাতিধর্ম্ম, অবস্থা-নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রমের মর্য্যাদা গান্ধিজীই প্রথমে দিয়াছিলেন। প্রকৃত মানবকল্যাণের আদর্শে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া তুলিবার স্বপ্ন পরিকল্পনাটির মধ্যে উজ্জ্বল।

তৃতীয়তঃ—পাঠ্যবিষয়ের আমূল সংস্কার ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কৃষ্টি-কেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার নির্দ্দেশ এই পরিকল্পনার অভিনবত্ব। আজ শিক্ষাক্ষেত্রে যে

সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা ক্রমশই জটিল রূপ ধারণ করিতেছে। হৃদয়ের সম্পদ, চিত্তবৃত্তির উন্নতি ও জীবন-সংগ্রামের পথে যোগ্যতা-অর্পণের প্রতি যে ঔদাসীন্য এতদিন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী রচনা করিতেছিল গান্ধিজী তাহার মূলে কুঠারাঘাত হানিলেন।

পাঠ্যতালিকার মধ্যে তিনি যে নব নব বিষয়ের সমাবেশ সাধন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মাতৃভাষার বিশেষ স্থান, স্বাস্থ্য ও সামাজিক শিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা, সঙ্গীত, নৃত্য ও অঙ্কন, বাগানের কাজ, ব্যায়াম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৃষ্টির আনন্দের মধ্য দিয়া উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃতির কোলে দেশের শিশু ক্রমশই ফুলের মত তারুণ্যের পূর্ণ গরিমা লাভ করিবে ইহাই ছিল সেই মহামনীষীর কল্পনা।

বৃত্তি-শিক্ষার পারদর্শিতা, কর্ম্মের মধ্য দিয়া নিয়মানুর্ত্তিতা শিক্ষা, স্বাভাবিক কর্ম্মানুরাগ, পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতার পরিপুষ্টি, মার্জ্জিত রুচি গঠন, আত্মপ্রকাশের প্রতি লক্ষ্য ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ—এই কয়েকটি উদ্দেশ্য পশ্চাতে রাখিয়া আলোচ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল।

পরিশেষে এই কথা বলা চলে যে আজ সমগ্র বিশ্বে যে নৈতিক আদর্শের অবনতি দেখা দিয়াছে, যে মানবত্বের অবমাননা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, সেই শোচনীয় সংকট হইতে পরিত্রাণের জন্য মহাত্মাজী বিশেষভাবে সজাগ ছিলেন। তাই তাঁহার ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মধ্যে তিনি ধর্ম্ম ও নীতিকে বিশিষ্ট আসন

দিয়াছেন। মানবপ্রীতি, সেবাধর্ম্ম, স্বার্থত্যাগ, জাতীয়তাবোধ ও সৎসাহসকে উদ্বুদ্ধ করিবার মানসে তিনি শিক্ষালয়ের দিন-পঞ্জিকার মধ্যে প্রার্থনা ও অন্যান্য পল্লীসেবার স্থান করিয়া দিয়াছেন।

সমালোচনার খাতিরে এই পরিকল্পনাকে অনেকে অসম্পূর্ণ বলেন। তাঁহাদের মতে ইহা কেবল বৃত্তিশিক্ষারই পরিপোষক। প্রকৃতি কৃষ্টি ও জ্ঞানোন্মেষের দিকে এই পরিকল্পনা নাকি একান্ত উদাসীন। দ্বিতীয়তঃ, আর্থিক সমস্যার সমাধানকল্পে গান্ধিজীর স্বপ্ন মাঝে মাঝে অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তৃতীয়তঃ, বর্ত্তমান সভ্যতার প্রতি বিরূপতা ও তাহাকে উপেক্ষা করিয়া প্রাচীন আদর্শের প্রতি প্রীতি এই পরিকল্পনার মধ্যে সমধিক। তিনি যুগের সহিত পা ফেলিয়া চলিতে নাকি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে গান্ধিজীর ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠন

(সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা)

গত মহাযুদ্ধের দামামা যখন আকাশ বাতাসকে মুখর করিয়া তুলিতেছিল, প্রচণ্ড হানাহানি ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকা যখন পৃথিবীর বুকে দানবের রুদ্ররূপকে প্রতিফলিত করিতেছিল, তখনই সাগরপারের স্তম্ভিত মানব শিক্ষাব্যবস্থার

পুনঃসংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল। তাই প্রকৃত মানব-গঠনের ও সমাজ-কল্যাণের আদর্শ লইয়া গান্ধীজী যে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ডের প্রচেষ্টায় অনুরূপ সর্ব্বগ্রাহী একটি পরিকল্পনার প্রবর্ত্তন হইল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের শিক্ষোপদেষ্টা হিসাবে, ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণের সাহায্যে, সার্জ্জেণ্ট সাহেবের এই ব্যাপক পরিকল্পনার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়াই ইহাকে সংক্ষেপে সার্জ্জেণ্ট-পরিকল্পনা বলা হয়। নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেন অথবা শিশুশিক্ষা হইতে সুরু করিয়া শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার সম্পর্ক সমাধানের প্রয়াস এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য।

এই পরিকল্পনার মধ্যেই প্রথমে ছয় বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স অবধি বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তাব করা হয়। বর্ত্তমান দৈন্যক্লিষ্ট সমাজের কল্যাণসাধনের জন্য (১) কার্য্যকরী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, (২) শিল্পশিক্ষার আয়োজন এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সার্জ্জেণ্ট রিপোর্টের বিবরণটিকে নিম্নলিখিত ধারায় লিপিবদ্ধ করা যায়—

নার্সারি ও শিশুশিক্ষা		৩-৫ বৎসর
নিম্ন বুনিয়াদী	”	৬-১১ ”
উচ্চ বুনিয়াদী	”	১১-১৪ ”

নিম্ন টেক্‌নিকাল শিক্ষা	১৪-১৬ বৎসর
(যান্ত্রিক শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, ও সওদাগরী শিক্ষা ইত্যাদি)	
কৃষ্টি বা জ্ঞানকেন্দ্রিক শিক্ষা	১১-১৭ ,,
শিল্পকেন্দ্রিক ,,	,, ,,
উচ্চ ও উচ্চতর যান্ত্রিক শিক্ষা	১৭-২০-২২ ,,
বিশ্ববিদ্যালয়	১৭-২০ ,,

ওয়ার্দ্ধা শিক্ষাপরিকল্পনার নিকট সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা বহুলাংশে ঋণী হইলেও কতকগুলি বিষয়ে ইহা অধিকতর অগ্রগতি দান করিয়াছে।

শিক্ষণ শিক্ষা, শিক্ষকগণের আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, গণশিক্ষা, হীনবুদ্ধি, বিকলেন্দ্রিয়দের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-পরিদর্শনের আয়োজন, অবসর বিনোদনের জন্য আমোদ-প্রমোদ ও চারু-কলার প্রবর্ত্তন এবং বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য কর্ম্মদপ্তরের প্রতিষ্ঠা সার্জ্জেণ্ট-পরিকল্পনার মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দেশের শিক্ষা যাহাতে পুঁথিগত ও গতানুগতিক হইয়া না পড়ে সে দিকেও এই পরিকল্পনার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাই দেশের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য মৌলিক গবেষণার উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। মোট কথা, জীবনের জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষাই সার্জ্জেণ্ট-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

এই পরিকল্পনার মধ্যে মঙ্গলের ইঙ্গিত যথেষ্ট থাকিলেও ইহা অসঙ্গতি ও ত্রুটী হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে।

প্রথমতঃ—এই পরিকল্পনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে তাহা কিরূপে সংগৃহীত হইবে? তাই পরিকল্পনার আড়ম্বর কিছু কমাইয়া ফেলাই সমীচীন।

দ্বিতীয়তঃ—এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ৪০ বৎসর সময় লওয়া হইয়াছে তাহা জাতির এই সংকট মুহূর্ত্তে অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয়তঃ—কেবল মনোনয়নের ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দান বা নির্ব্বাচন-প্রথার যে উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে পূর্ণ সংগতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

চতুর্থতঃ—পরিকল্পনার মধ্যে বিলম্বিতবুদ্ধিদের সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই।

স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে যে যে সমস্যা আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সে সব সমস্যার সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ ও সমাধান এই পরিকল্পনায় আশা করা গিয়াছিল।

সমালোচকের দৃষ্টিতে হয়ত অনেক অসংগতিই দৃষ্টিপথে আসিবে, কিন্তু কেবল ত্রুটী অনুসন্ধান অপেক্ষা যাহাতে ভবিষ্যতে পূর্ণতর পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কি ভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা ক্রমপরিণতির পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাই লক্ষণীয়। এই পুস্তকে শিক্ষা-পরিকল্পনার বিস্তৃত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়—কি ভাবে সামাজিক ও অন্যান্য পরিবর্ত্তনের সহিত পা ফেলিয়া চলিবার জন্য শিক্ষা-

পরিকল্পনারও রূপপরিবর্ত্তন সাধন করিতে হয় সেই দিকে আলোকপাত করাই আমার উদ্দেশ্য।

বয়স্ক শিক্ষা

আলোচনাঃ—পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে নিম্ন স্তর হইতে ক্রমশঃ বয়স্কদের শিক্ষার দিকে সজাগ হইলে সুফলের আশা অধিক। অর্থাৎ প্রথমে শিশুশিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিয়া পরে বয়স্কশিক্ষার আয়োজন করাই সমীচীন। কিন্তু যে দেশের অধিকাংশ বয়স্কই অশিক্ষিত সেখানে এই নীতি কতদূর কার্য্যকরী তাহা চিন্তা করিলেই সুস্পষ্ট হইবে। দেশের গণশিক্ষার পথে অগ্রগতি লাভ করিতে হইলে বয়স্কশিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা অপরিহার্য্য। সত্য কথা বলিতে কি, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত শিক্ষার গতি যদি বিরামবিহীন না হয়, যদি এই শিক্ষাপরিকল্পনার মধ্যে বয়স্কশিক্ষার একটি বিশিষ্ট স্থান না থাকে তবে জাগ্রত গণতন্ত্রের আশা সুদূরপরাহত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরকারের সমস্ত শুভেচ্ছা ও পরিকল্পনা সত্ত্বেও নানা কারণে তদনুযায়ী সুফল বাস্তবে রূপ লইতেছে না। অবশ্য মাত্র পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই চেতনার উদয় হইয়াছিল এবং ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন সংস্কার আইন প্রবর্ত্তনের পর বয়স্কশিক্ষা প্রসার প্রয়াসে প্রকৃত প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ইতিহাস ও পটভূমিকা ঃ—

বয়স্কদের মধ্যে, বিশেষতঃ শ্রমিক, মজুর ও অন্যান্য কর্ম্মীদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান-পরিবেশনের আয়োজন সুরু হইয়াছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষানুরাগী ও শিল্পপতির প্রচেষ্টায় ও শ্রমিকদের নিজেদের আগ্রহে। তাই দেখা যায় ১৯১৯ সনের পূর্ব্বেই কয়েকটি নৈশবিদ্যালয় বয়স্কদের জন্য প্রায় প্রতি প্রদেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমে যে আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা দেখা গিয়াছিল ক্রমশই যেন তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। তাই এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। পরে ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কারের ফলে যে গঠনমূলকশিক্ষার প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছিল তাহাতে মান্দ্রাজে লোকশিক্ষার বিশেষ আয়োজন দেখা দিয়াছিল। ক্রমশঃ বোম্বাই প্রদেশেও সরকারের অনুপ্রেরণায় লোকশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক আয়োজন দেখা গেল। এইরূপে বয়স্কশিক্ষা ব্যাপারে একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার আবহাওয়া বিরাজ করিতে লাগিল। ফলে যুক্তপ্রদেশে এবিষয়ে বিপুল আয়োজন সুরু হইল। প্রায় তিন হাজারের উপর অস্থায়ী শ্রেণীতে প্রায় ষোলহাজার বয়স্ক স্ত্রীলোক শিক্ষা লাভ করিতেছিল। ১৯৪২ সনে বঙ্গদেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার বয়স্কদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

এখন দেখা যাউক, বয়স্কশিক্ষার পরিকল্পনার স্বরূপ কি ? (১) কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, (২) কাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া

হইবে, (৩) কত দিন শিক্ষা দেওয়া হইবে, (৪) কোথায় ও কখন শিক্ষা হইবে এবং (৫) কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে—এই পাঁচটি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে জাগে।

কি শিক্ষা দেওয়া হইবে ঃ—

বয়স্কশিক্ষার পাঠ্যসূচী লইয়া মতবিরোধ দেখা দিলেও প্রত্যেকের উদ্দেশ্য যে অভিন্ন একথা বলা যায়। প্রকৃত নাগরিক প্রস্তুতীকরণের জন্য যে যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা দেশ-কাল-পাত্রভেদে নির্ব্বাচন করাই শ্রেয়ঃ। এই হিসাবে পঠন, লিখন, হিসাব-শিক্ষা ব্যতীত স্বাস্থ্য, দেশের ঐতিহ্য, কুটীর-শিল্প, স্বায়ত্তশাসন, শস্য উৎপাদন ও শস্যসংরক্ষণ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ, অগ্নিনির্ব্বাপণ, বাঁধনির্ম্মাণ, পল্লী উন্নয়ন, সাধারণ জ্ঞান, গৃহচিকিৎসা, সঙ্গীত, লোকবৃত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় বয়স্কশিক্ষার পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত হওয়া সমীচীন। মোট কথা, প্রত্যেক নরনারীই যাহাতে দেশ ও দেশের মাটিকে ভালোবাসিতে শেখে, দেশের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হইয়া দেশের কল্যাণ-সাধনের শক্তি ও শিক্ষা সঞ্চয় করিতে এবং বাস্তবজীবনের পাথেয় আহরণ করিতে পারে, সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিলে প্যাঠ্যতালিকা ত্রুটীমুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

কাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে ঃ—

বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা যতদিন না প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আবশ্যিক করিতে সমর্থ হইতেছে ততদিন

বয়স্কশিক্ষায় কোন বয়সের উল্লেখ করা কঠিন। তবে সাম্প্রতিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা ছয় বৎসর হইতে এগার বৎসরের বালক-বালিকার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া উপস্থিত এগার বৎসর হইতে চল্লিশ বৎসরের স্ত্রীপুরুষগণের শিক্ষার গুরু দায়িত্ব বয়স্কশিক্ষাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

তবে অভিজ্ঞতা, চিত্তবৃত্তি ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষার্থিগণকে তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া লইলে শিক্ষাদান-কার্য্য সুগম হয়। তাই ১১ হইতে ১৬, ১৭ হইতে ২৫, এবং ২৬ হইতে ৪০ বা অনুরূপ তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করিয়া শিক্ষাদানের আয়োজন সুরু করিলে ভালো হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বয়স্কদের অভিজ্ঞতা ও পরিণত মনের জন্য শিক্ষাকার্য্য দ্রুত সম্পন্ন হইতে পারে। শিশুদের ন্যায় অপরিণত মন লইয়া শিক্ষককে বিব্রত হইতে হয় না।

কতদিন শিক্ষা দেওয়া হইবে ঃ—

বয়স্কদের শিক্ষাকাল সম্পর্কে কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর। ডক্টর লব্যাকের পরিকল্পনা অনুযায়ী মাত্র তিন চার মাসের মধ্যেই নিরক্ষরতাকে দূর করা যায় কিন্তু কেবল নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইলেও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে অন্ততঃ এক বৎসর কাল শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। তবে ভারতের অর্থনৈতিক ও সমাজ-সমস্যার কথা

চিন্তা করিলে মনে হয় যে এই শিক্ষাকাল যত অল্প হয় ততই মঙ্গল।

লেখাপড়া শিক্ষার জন্য একটি সহজ সরল প্রণালী অবলম্বন করিলে শিক্ষাকাল ও শিক্ষার কার্য্যকারিতা বিষয়ে উন্নতি আশা করা যায়।

কোথায় ও কখন শিক্ষা দেওয়া হইবে ঃ—

তাই দেখা যায় যে অন্ততঃ এক বৎসর প্রত্যেক বয়স্ক বা বয়স্কার যে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার প্রয়োজন। কোন বাঁধাবাধি নিয়মে এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না করাই বাঞ্ছনীয়। তবে অবসর ও ব্যক্তিগত সুবিধা অনুযায়ী অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় এবং বৎসরের এক একটি অংশে আবৃত্তি, অভিনয়, কথকতা, বেতার-যন্ত্র ও বক্তৃতা প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য অনেকেই অভিমত পোষণ করেন! যতদিন ইহাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা না করা যায় ততদিন যে কোন প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে, পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্রে বা অন্য কোন সাধারণ পাঠাগার বা উন্মুক্ত স্থানে এই শিক্ষা দেওয়া চলে। সংক্ষেপে বলা যায় যে চিত্তবিনোদনের মধ্য দিয়া তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে বিভিন্ন কার্য্যকরী বিষয় শিক্ষা দিলে সুফলের আশা আছে।

কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় ঃ—

বয়স্কদের শিক্ষা ব্যাপারে একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে যে ইহাদের

অধিকাংশই নানা সাংসারিক কর্ম্মে জড়িত এবং জীবনের বিবিধ সমস্যাই ইহাদের জীবনকে বিড়ম্বিত করে। তাই শিক্ষা-প্রণালী এইরূপ সহজ, চিত্তাকর্ষক ও বৈচিত্র্যময় হওয়া উচিত যাহাতে অল্প আয়াসে এবং অল্প ব্যয়ে শিক্ষা নির্ব্বাহিত হইতে পারে। আনন্দের মধ্য দিয়া নাগরিকতা-বোধের উদ্বোধন বয়স্কশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। সভা-সমিতি, সহজ সরস বক্তৃতা ও আলোচনা, বেতার ও আলোকচিত্র, অভিনয় প্রভৃতির সাহায্যে তাহাদের সুপ্ত প্রাণে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিলে এবং সঙ্গে লিখন-পঠন বিষয়ে জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা রাখিলে আয়োজন সার্থক হইবে সন্দেহ নাই।

কে শিক্ষা দিবেন?—

এখন প্রশ্ন উঠে যে এই শিক্ষাদানের দায়িত্ব কাহার উপর ন্যস্ত হইবে। যদিও বেসরকারীভাবে বহু সহৃদয় ব্যক্তি ও শিল্পপতি এই কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন তবুও সমস্যার গুরুত্ব বিচার করিয়া বিশেষ সরকারী প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সাধারণতঃ গ্রামের শিক্ষিত অভিজ্ঞ প্রবীণ প্রতিপত্তিশালী নর-নারী দ্বারা এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে। কিন্তু কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে। অন্ততঃ এক জন বেতনভোগী প্রধান শিক্ষকের অধীনস্থ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক না থাকিলে এই দুষ্কর কার্য্যের দ্রুত সাফল্য লাভের আশা অল্প। তাই বয়স্কশিক্ষা পরিকল্পনার প্রাথমিক আয়োজন হিসাবে উক্ত ব্যবস্থাই গৃহীত হইয়াছে।

এই পরিকল্পনা আজ কতদূর ফলপ্রসূ হইয়াছে বা হইতেছে সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। উত্তরস্বরূপ বলা যায় যে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম নিতান্ত সহজ-সাধ্য নহে—তাই ইহা সময়সাপেক্ষ।

যে অজ্ঞানের অন্ধকার এতদিন জমাট বাঁধিয়াছিল স্বাধীনতার সূর্য্যোদয়ে তাহার কুহেলী কাটিয়া আসিতেছে সত্য কিন্তু আজও ভারতের দিগন্তরেখা অস্পষ্ট। তাই নব নব আয়োজন ও দেশব্যাপী চেতনা, সেই শুভদিনকে আসন্ন করিয়া তুলুক—এই প্রতীক্ষায় আজ ভারতের প্রত্যেক নরনারীই আকুল।

শিশুশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, স্বল্পব্যয়ী শিক্ষা, ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষা-সমস্যার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমাধানেরও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ফলে আজ দিকে দিকে আয়োজন দেখা দিয়াছে—বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, ভারত-সরকার ও শিক্ষানুরাগী সম্প্রদায় প্রত্যেকেই আজ উপলব্ধি করিয়াছেন যে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই শিক্ষার এই প্রয়োজন-বোধকে ধনতান্ত্রিক, শিল্পপতি হইতে সুরু করিয়া প্রত্যেকের হৃদয়ে বিশেষরূপে জাগরূক করিয়া তুলিতে না পারিলে সমাধানের আশাও কম। কেবল সরকার এই কুশিক্ষা বা অজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বিজয়-গৌরব লাভ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

সম্পূর্ণ

বিষয় সংকেত

অ

আ

গ

চ

ছ

জ

ড

ত

স

হ

পরিভাষা

অনুকরণ	Imitation
অনুভাবণ	Sympathy
অনুমান	Suggestion
অনুশীলনী	Exercise
আত্মউন্মোচন	Self expression
আত্ম-নিয়ন্ত্রণ	Self adjustment
আবাসিক বিদ্যালয়	Residential School
উপশিক্ষক	Private Tutor
ঐচ্ছিক	Optional
কৃষ্টি	Culture
কৈশোর	Adolescence
ক্রমপরিণতি	Development
ক্রিয়াকেন্দ্রিক	Centering activity
গণশিক্ষা	Mass Education
চিত্তবৃত্তি	Mental Characteristics
পরিণতি	Adulthood
পরিপ্রেক্ষিত	Perspective
পরিবেশ	Environment
পাঠ্যতালিকা	Curriculum
প্রকল্প	System
প্রাকৃতবাদ	Naturalism

বয়স্কশিক্ষা	Adult Education
বংশানুবর্ত্তন	Heredity
বিবর্ত্তন	Evolution
বুদ্ধি পরিমাপ	Measurement of intelligence
বৃত্তিশিক্ষা	Vocational Education
ব্যক্তিত্ববাদ	Impressionalism
ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য	Individuality
ভারসাম্য	Equilibrium
মনোগত বয়স	Mental age
মানসিক মান	Intelligence Quotient
যান্ত্রিকতাবাদ	Mechanical view
যৌনশিক্ষা	Sex Education
শিক্ষার্থী	Educand
শৈশব	Childhood
সঙ্গলিপ্সা	Gregariousness
স্ফূর্ত্তিবাদ	Emancipationalism
স্বাভাবিক প্রবণতা	Natural Tendency
স্বাভাবিক রসানুভূতি	Temperament
হীনবুদ্ধি	Feeble-minded

27 APR 1960
13 DEC 1960
19 DEC 1960
3 JAN 1961